বৈশাখী-বাঙলা

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

দাম—এক টাকা

প্রকাশক—
শ্রীপ্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
সারস্বত-সাহিত্য-মন্দির
বৰ্দ্ধমান

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ মজুমদার
"বি, পি, এম্‌স্ প্রেস"
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

—০০৪০৪০০—

পুণ্যব্রতপরায়ণা

শ্রীশ্রীযুক্তা মহারাণী অধিরাণী সাহেবা, বর্দ্ধমান

মাননীয়াসু :—

আপনি আর্য্যধর্ম্মে ও আর্য্যব্রতে পরম শ্রদ্ধাশীলা। ব্রতে, নিষ্ঠায়, পূজায় আপনি একান্ত অনুরক্তা। রাজ-ঐশ্বর্য্যের মাঝে পুণ্যকে আপনি বরণ করিয়া ব্রত-সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। "কাল বৈশাখী"তে আর্য্য-সাধনার কথা গাহিয়াছি বলিয়া ইহা আপনাকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য বোধ করিলাম।

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

স্মরণে—

—∞∞—

মা !—

"বৈশাখী-বাঙলা" তোমাকেই নিবেদন করিলাম। স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ করিও, বাঙলার প্রাণে যেন বৈশাখের দীপ্তি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, বাঙালীর দেহে যেন বৈশাখী শোভা বিকশিত হয়।

বধমাক্সা, বর্দ্ধমান
১৩৩৭

স্নেহ-ধন্য—
—বলাই—
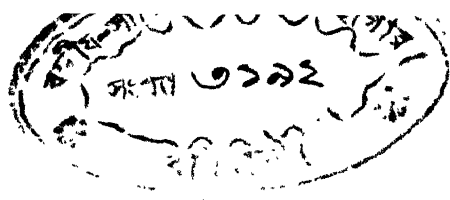
বৈশাখী-বাঙলা

বন্দেমাতরম্

বন্দেমাতরম্—গান নহে—মন্ত্র। মন্ত্রের এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকেন। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দেবতা—স্বদেশ। বন্দে-মাতরম্ সাহিত্যিকের কল্পিত কথা নহে; উহা মন্ত্র—সত্যই মন্ত্র। মন্ত্রের শক্তি এবং মাহাত্ম্য 'বন্দে মাতরম্' এই ধ্বনির মধ্যে নিহিত আছে।

ঊনবিংশ শতকে বিলাতী বিদ্যার সহিত বিলাতী স্বাদেশিকতা—পেট্রিয়টিজিম্ এ দেশে আমদানি হইয়াছিল। ঐ তথাকথিত স্বাদেশিকতা বস্তুতন্ত্রবিহীন অবস্তু। উহার নিকট স্বদেশের রূপ এবং স্বরূপ অবহেলিত হইয়াছিল। তাই দেখা গেল, ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশভক্ত দেশের মর্ম্মস্থান হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। দেশভক্তির নামে দেশদ্রোহই জাতীয় চিত্তকে আক্রান্ত করিতেছে।

ঋষি বঙ্কিম এমন দিনে ধ্যান-দৃষ্টিতে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র প্রত্যক্ষ করিলেন। স্বাদেশিকতা তাহার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। বন্দে-মাতরম্—মন্ত্র। কিন্তু মা কি ও কেমন? কোন্ রূপে তাঁহার

ধ্যান ও পূজা করিব ? ঋষি তাঁহার মন্ত্রের বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণধারিণী, কমলা কমলদলবিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী।"

যুগের উপাস্য যে স্বদেশ—দেশমাতৃকা, তিনি মাদারলাণ্ড (Mother-Land) নহেন, একটা ভৌগলিক মৃত্তিকা-সংস্থান ও নহেন ; তিনি মা দুর্গা—দশপ্রহরণধারিণী। বুঝিলাম, মাকে কোন্ রূপে প্রত্যক্ষ করিব, কিরূপে পূজা করিব !

বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে শুধু যে স্বদেশের স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিতে পাইয়াছি তাহা নহে, স্বদেশসেবার একটা ইঙ্গিতও পাইয়াছি। আনন্দমঠে সন্ন্যাসীদের তপশ্চর্য্যায় বুঝিয়াছি যে, দেশসেবা ও দেশভক্তি তপস্যামূলক। ভারতীয় সাধনা সভ্যতার সহিত ভারতীয় স্বাদেশিকতার গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। খেয়ালে, উত্তেজনায়, সাময়িক প্রবাহে দেশভক্তি এবং দেশসেবা কিছুই হয় না, হইতে পারে না।

উত্তেজনার একটা কুহক আছে। ইহাতে সাময়িক একটা চাঞ্চল্য ঘটাইলেও সত্য লাভের অন্তরায় ঘটায়, উত্তেজনার আতিশয্য বস্তুকে দূরে সরাইয়া রাখে। তাই আনন্দমঠের মহাপুরুষ সত্যানন্দ সন্ন্যাসী স্বদেশভক্তদের দীক্ষা দিতেন, একটা তপস্যার আনুগত্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রকৃত দেশপ্রেমিক করিয়া তুলিতেন।

আনন্দমঠে দেশভক্তি-সাধনার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট পরিচয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই সাধনার একটা উজ্জ্বল মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন—তাঁহার দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থে ; ভবানী

পাঠক পাঁচটী বছর ধরিয়া দেবীরাণীকে শিক্ষা দিলেন। সে শিক্ষা ত্যাগের শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা, ভগবদ্‌ভক্তির শিক্ষা। পাঁচটী বছর সুকঠোর শিক্ষার পর প্রফুল্ল 'দেবী চৌধুরাণী' হইয়া দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন।

বলিয়াছি, যুগের উপাস্য স্বদেশ। আবার এই স্বদেশ ভারতীয় সাধন-তন্ত্রের অঙ্গীভূত; তাই বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বকে, কল্পনাকে সত্য করিতে আবির্ভূত হইলেন—বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ বৈরাগীও নহেন, সন্ন্যাসীও নহেন। বিবেকানন্দ ভারতের স্বারাজ্যসিদ্ধির জীবন্ত বিগ্রহ। সেই জন্য বিবেকানন্দকেও দেখিলাম তপস্বিরূপে এবং তাঁহার কণ্ঠে মন্দ্রিত হইয়া উঠিল ঃ—"স্বদেশের দুঃখে তোমার কণ্ঠে কি অন্নগ্রাস বাধিয়া যায়, তুমি কি নিদ্রা যাইতে পার না, দেশের দুঃখে তুমি কি পাগল হইয়াছ ?"

মন্ত্র লাভ করিবার পর বুঝিয়াছি যে, আমাদের দেশভক্তিকে তপস্যার পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিতে হইবে। এবং যতক্ষণ ইহা না করিতে পারিব, ততক্ষণ পেট্রিয়টিজিমের আদি-প্রবর্ত্তক শাসকের মন্ত্রিত্ব করিবেন, স্বদেশসেবক এজেণ্ট-প্রোভোকেটর হইবে, দেশ-প্রেমিক এ্যাপ্রুভার হইবে, স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য অর্থ পাইয়া স্বদেশভক্ত চম্পট দিবে। ফেরঙ্গ পেট্রিয়টিজিমের অশুদ্ধ ভারস্পর্শ হইতে মুক্ত করিয়া স্বাদেশিকতাকে তপশ্চর্য্যার পর্য্যায়ে আনিতে না পারিলে যাহা হয়, বাঙ্গালা ও ভারতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে তাহা উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত আছে।

বন্দেমাতরম্ মন্ত্র জপসিদ্ধ। বন্দেমাতরম্ জপ করিতে করিতে মায়ের প্রতি ভক্তি উদ্রিক্ত হইবে। এই ভক্তির উদ্বোধন হইলে দেশ-উদ্ধার সহজ হইবে। যাহা আজ কৃচ্ছ্র কঠোর হইয়া আছে, যাহা আজ দ্বিধা-খণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, যে পথ আজ সংশয়ের অন্ধকারে আবৃত, তাহা সুসাধ্য, সুগম ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে:

"আনন্দমঠের" উপক্রমণিকায় দেশ-সেবক যখন বলিলেন,—

"পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব"

তখন উত্তর হইল,—

"জীবন তুচ্ছ, সকলেই উহা দিতে পারে"।

সাধক প্রশ্ন করিলেন,—

"আর কি আছে, আর কি দিব"!

প্রত্যাদেশ হইল—

"ভক্তি।"

এই ভক্তিই বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের মর্ম্মবস্তু। এই ভক্তির প্রবোধনা ঘটিলে, ভারতীয় জাতির জীবনে যে তেজোবীর্য্য স্ফুরিত হইবে, তাহার গতিরোধ করা বিশ্বমানবের অসাধ্য হইবে এবং সেই ভক্তি প্রভাবেই আমাদের স্বারাজ্যসিদ্ধি সম্ভব হইবে।

দেশের অন্তরে চাঞ্চল্য আসিয়াছে, উত্তেজনা উদ্দীপনা জাগিয়াছে। এই চাঞ্চল্য এবং উদ্দীপনাকে ভক্তিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। যেখানে 'চালাকি' আছে, সেখানে "প্রেম ও

সত্যানুরাগকে” প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মাটির দেশকে দুর্গা মূর্ত্তিতে পূজা করিতে হইবে, রাজনীতিকে—ফেরঙ্গ রাজনীতিকে তপস্যার পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে মা প্রসন্ন হইবেন, জাগ্রত হইয়া দশভূজা দশপ্রহরণধারিণী, অসুরনাশিনী রাজরাজেশ্বরীরূপে অধিষ্ঠিতা হইবেন। যে দিন এইরূপ করিতে পারিব, সেই দিন বন্দেমাতরম্ মন্ত্র তাহার সিদ্ধ-শক্তি লইয়া জাতীয় জীবনকে অর্থ ও পরমার্থ দান করিবে—বন্দেমাতরম্।

বৈশাখ

ভীম-সুন্দর, কমণীয়-কঠোর, রুদ্র-স্নিগ্ধ হে অগ্রজ! হে নববর্ষের প্রথম স্পর্শ! হে বৈশাখ! স্বাগতম্—সুস্বাগতম্! প্রভাতে তোমার মাধুর্য্যের মনোহারিত্ব, মধ্যাহ্নে রুদ্রবিকাশ, অপরাহ্নে আবার প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি। বসন্তের স্নিগ্ধ সুষমার পর তুমি আনিয়াছ,—পৌরুষের প্রদীপ্ত স্পর্শ। হে ভীম সুন্দর! আজ নববর্ষ-প্রভাতে আমরা ত্রিশকোটী নর-নারী, তোমাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। তোমায় নমস্কার করিতেছি!

নববর্ষ—অবিচ্ছিন্ন কালপ্রবাহের একটা ছেদ মাত্র। যাহা একটানা চলিতেছে, যাহা অনন্ত অবিশ্রান্ত,—যাহার পরিমাপক কিছুই নাই, মানুষের মনের মানদণ্ডে মাপিয়া লইয়া তাহাকে বুদ্ধিগম্য করিতে হয়। দিন, মাস, বর্ষ—ইহাই। নহিলে কালের আবার নূতন পুরাতন কি? কাল চির নবীন, আবার চির পুরাতন। যাহা চিরন্তন, তাহাই চিরপুরাতন।

নূতন, পুরাতনেরই সমাবর্ত্তন। একান্ত অভিনব কিছুই নাই, থাকিতে পারে না। যাহা প্রাচীনের প্রতিষ্ঠাবেদীতে প্রতিষ্ঠিত নহে,

যাহা সনাতনের জঠরে জন্মলাভ করে নাই, যাহা একান্ত আকস্মিক, তাহা নূতন ত নহেই, পরন্তু কিছুই নহে, তাহা মরীচিকার মত ভ্রান্তি।

আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্যে নূতন পুরাতনের বিচার। বার্দ্ধক্যের সীমান্তদেশে অবস্থিত আমি—আমি স্থবির, আমি জীর্ণ। আবার সূতিকাগৃহের হর্ষ-কোলাহল সমুত্থিত করিয়া হুলু ও শঙ্খধ্বনির মাঝে যে শিশু জন্মলাভ করিল,—সে তরুণ, সে নূতন। একই প্রাণ-শক্তির, একই আত্মার দুইটা বিভিন্ন প্রকাশ। শিশুর জন্ম সদ্যঃ—কালপ্রবাহে তাহার আত্মা একবার নিমজ্জিত হইয়া লোকলোচনের অন্তরালে গিয়া আবার প্রকট হইয়াছে ; আর আমি ও তুমি কাল-প্রবাহে একটু দীর্ঘকাল ভাসিয়া রহিয়াছি। তুমি আমি বৃদ্ধ, শিশু—নবীন।

বৈশাখ নূতন নহে। আত্মার বিস্মৃতি অপনোদন করিয়া, কালের কুক্ষিকুট্টিমে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে অযুত কোটী বৈশাখ সেখানে ভীড় করিয়া রহিয়াছে। বৈষ্ণবের সেই গান "কত চতুরানন"। সৃষ্টি কি সামান্য, তুচ্ছ, আকস্মিক, যে তাহার কোন একটা আবির্ভাবকে নূতন বলিব !

বৈশাখ নূতন নহে—সনাতন। কিন্তু নূতন ও পুরাতন আছে। নূতন পুরাতনের বিচার—ভাব ও ভাবনার বিচারে, আশা ও আদর্শের নিকষে। যে আকাঙ্ক্ষা, যে ভাবনা বাঁধিয়া রাখে, একটা মোহচক্র সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই আবদ্ধ করিয়া ফেলে, তাহাই

প্রাচীন—তাহাই জরাজীর্ণ। বৈশাখকে অবলোকন কর, করিয়া নূতন-পুরাতনের বিচার কর।

বৈশাখ—শুভদ বৈশাখ! সমীরণে তাহার চম্পক চামেলীর সৌগন্ধ, কুঞ্জে কাননে তাহার পুলকিত কাকলী-কূজন, পরশনে তাহার অমৃতের অনুভূতি! কত সৌন্দর্য্য, কত সম্পদ, কত সুষমার সমারোহ! মোহ আনে বৈকি! সাধ হয়—কালের অনন্ত প্রবাহ-বক্ষে শুধু বৈশাখ—এই মনোজ্ঞ, এই প্রফুল্ল বৈশাখ—একটি প্রস্ফুটিত শতদল শোভায় ফুটিয়া থাক, আর তাহারই মনোহারী আবেষ্টনে প্রলুব্ধ মধুপের মত মুগ্ধ রই।

বৈশাখ কিন্তু মুগ্ধ চিত্তের মোহ ভাঙ্গিয়া দেয়। বৈশাখ তাহার নিজস্ব সম্পদ, তাহার গৌরব গর্ব্ব, তাহার সমস্ত আশীর্ব্বাদের আস্পদকে প্রলয় ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়। বৈশাখের প্রভাতে দক্ষিণ অনিলের মৃদু আন্দোলন, সায়াহ্নে তাহার ভৈরব-নর্ত্তন। যে পুষ্প কোরককে বৈশাখ তাহার প্রভাতী বক্ষে স্নেহের শিশিরসেচনে, মলয়-মারুতের সোহাগ-আন্দোলনে কত যত্নে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাকেই সায়াহ্ন বেলায় প্রমত্ত দাপটে ঝরাইয়া দেয়! তাহার সাধের রচনা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে! তাহার সুরভিত স্বপ্নের সার্থক আবির্ভাবকে দলিয়া পিষিয়া ছারখার করে—এই বৈশাখ!

বৈশাখ নূতন ঐ জন্য! বৈশাখ সৃজন-দক্ষ, বৈশাখ মোহের মায়া-আবরণে আচ্ছন্ন হয় না। আর্য্য গৃহস্থের প্রকৃতি স্মরণ কর!

যৌবনসঞ্চিত বিত্তবিভব জীবন মধ্যাহ্ন অপগত হইবার পূর্ব্বেই গার্হস্থ্যধর্ম্মী আর্য্য তাহাকে ধূলিমুষ্টির মত নিক্ষেপ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। বৈশাখের কাল-বৈশাখী! দিবসারম্ভের সেই সৌন্দর্য্য-সমারোহ কাল-বৈশাখীর রুদ্রযজ্ঞে আহুতি দান! অভিনব ইহারই নাম! নূতন নহিলে পাইবে কোথায়! ধাতার সৃজিত পদ্মটি তাহার শতদল লইয়াই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সিসৃক্ষায় আর অভিনব কল্পনা নাই যে!

বৈষ্ণবভক্ত শ্রীভগবান্‌কে নটবর বলেন! নটশ্রেষ্ঠ তিনি অভিনয় করেন। আজ বালক, কাল বৃদ্ধ! আজ বৃন্দারণ্যের গোপ-গোপীর ক্রীড়া পুত্তলিকা, আবার পরক্ষণে কুরুক্ষেত্র প্রমাথী সারথিশ্রেষ্ঠ। ইহাই নূতনত্ব। 'নিতুই নব'। সেই একই পরমাত্মার নব নব রূপান্তরে নব নব আবির্ভাব। ভগবানের শ্রীমুখের বাণী—'অচলোঽয়ং সনাতনঃ।'

নূতন নাই, থাকিতে পারে না। সবই সনাতন। সেই জন্য অভিনব আবির্ভাবের ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র দেখিয়া প্রফুল্লিতা ময়ূরীর মত পুচ্ছান্দোলন করিতে নাই। তাই আজ বৈশাখী মহিমার স্পর্শে প্রবুদ্ধ চিত্তে প্রজাপতির পতঙ্গবৃত্তি পরিহার করিয়া সেই অচল সনাতন—সেই শাশ্বত সুন্দরের চরণতটে জাতীয় চিত্তখানিকে নিবেদন করিয়া প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি "শিষ্যস্তেঽহং স্বাধি-মাম্ ত্বাং প্রপন্নম্।"

নূতনের মাদকতা আছে, মনোহারিত্বও আছে। সহজেই তাই

নূতন প্রলুব্ধ করে। প্রজাপতি সহস্রফুলে তাহার পতঙ্গবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহে। এই আকাঙ্ক্ষার নাম দুরাকাঙ্ক্ষা। ইহা অতৃপ্তির বহ্নি জ্বালাইয়া তোলে।—মৃত্যু অপেক্ষা ইহা মারাত্মক। জীবনের প্রত্যেক পলকে মৃত্যুদণ্ড দ্বারা আঘাত করে; তাহার পর বিনষ্ট হয়। ইহাই অবিদ্যার উপাসনা। ইহাই "অন্ধং তমঃ প্রবিশ্যন্তি, যঃ অবিদ্যায়াম্ উপাসতে।"

বর্ষের প্রথম আগমনে তাই নূতন পুরাতনের পার্থক্য খুঁজিতেছি। দেখিতেছি মরীচিকার প্রলুব্ধ আশা লইয়া নূতন আসিয়াছে কি না! সমাহিত চিত্তে ধ্যান করিতেছি—পতঙ্গবৃত্তি হৃদয় মনকে উদ্বেলিত করিতেছে কি না! নূতন যদি ক্ষণিক হয়, আকস্মিকের আড়ম্বর হয়, তবে চপল ও প্রলুব্ধ চিত্তকে তাহার অভিমুখ হইতে প্রত্যাহার করিয়া সনাতনের শাশ্বত সুন্দর মহিমার কাছে প্রণত-শীর্ষ হইতেছি! সেই নূতনেরই আগমনী গাহিতেছি, যিনি পুরাতন এবং সনাতন, যিনি যুগে যুগে অপচীয়মান মানবতাকে সমুদ্ধার করিতে আবির্ভূত হন। একদিন যিনি বেদোদ্ধারে মীন-রূপী, ক্ষত্রিয়নিধনে পরুষ পরশুধারী, আবার অপর যুগে যিনি করুণাসাগর বুদ্ধ, সেই পুরাতন পুরুষেরই আমরা প্রতীক্ষাকাতর। তাই নববর্ষের—বৈশাখের প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি, 'শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।'

রামের গণ্ডী—শান্তি ও স্বস্তির আশ্রয়। অভয়ের মাতৃ-অঙ্ক, গৌরব-গরিমার অমরাভূমি। কিন্তু রামের গণ্ডী একটি পর্ণকুটীর! আড়ম্বরহীন, বস্তুবিরল, সমারোহশূন্য। কিন্তু ঐ গণ্ডীর মাঝে রহিলে

কোন বিপৎপাতের আশঙ্কা থাকে না ; পরন্তু থাকে দর্প-দম্ভ, থাকে প্রতিষ্ঠার শ্লাঘা। আর থাকে অভয় পরিস্থিতি ! রামের গণ্ডী দুয়ারে কিন্তু সোনার হরিণ আসিয়া বহু ভঙ্গিম-ছন্দে নৃত্য করিতে থাকে। উহা মায়াবী নূতন, উহা মৃত্যুর আকর্ষণ, উহা অধঃপাতের স্বর্ণ-সোপান ! বৈশাখের বিশোভিত বাসরে বিহ্বল হইয়া যেন ঐ রাক্ষসী নূতনের কবলে না পড়ি। এই জন্য আজ ঘট উৎসর্গ করিতে হয়। পিতৃ-পিতামহগণকে জলগণ্ডূষ দান করিতে করিতে প্রাচীনের দিকে শ্রদ্ধা-দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হয় কি আমার নিজস্ব, কি আমার মঙ্গলের নিদান ! কোন্‌টি আমার অভয় প্রতিষ্ঠা—রামের গণ্ডী !

বৈশাখে আশাও আছে, আতঙ্কও আছে। আশা হইতেছে—স্থবিরতার অপনোদন, উৎসাহ উদ্দীপনার নব জাগৃতি। ভীতি হইতেছে—পতঙ্গবৃত্তির আক্রমণ। কালবৈশাখী দিবে নব-চেতনা, নবীন উদ্দীপনা। দিবে প্রভঞ্জনতুল্য দুর্ব্বার গতি, ঝটিকার দাপট, প্রমত্ত প্রলয়ঙ্কর গতিবেগ। প্রভাতের ঝঙ্কৃত কূজনে যে আবেশে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, বৈশাখের বৈকালী—কাল-বৈশাখী স্পর্শে তাহা দূরীভূত হইয়া রুদ্র ভৈরবের তাণ্ডব-নৃত্যে মাতিতে পারিব। সংসারের রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইবার প্রেরণা লাভ করিব। এই জন্যই ত বৈশাখের এত সমাদর ! এমন সোহাগের—শ্রদ্ধার অভ্যর্থনা।

বৈশাখ—পিনাকপাণির হোমানলশিখা। মধ্যাহ্নে ইহার প্রদীপ্ত

প্রভা, সায়াহ্নে ইহার প্রলয়-নর্ত্তন। সব জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়; সব ভাঙ্গিয়া চূরিয়া চূরমার হইয়া পড়ে। ঈশানের বিষাণ, তাণ্ডবের উতরোল। বাসর-বিলাস করিবে কে? দেবতার রুদ্র যজ্ঞের হোমশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। ঝঞ্ঝার প্রলয় আবর্ত্তে সংহারের মন্ত্র উদ্‌ঘোষিত হইতেছে—"নিহতাঃ পূর্ব্বমেব।"

বৈশাখকে তাই অভিনন্দন জানাইতেছি—স্বাগতম্, সুস্বাগতম্! জঞ্জাল, চারিদিকে স্তূপীকৃত জঞ্জাল। তাই চাহিতেছি প্রলয়ঙ্কর বহ্নিদাহ! জীর্ণ আবর্জ্জনায় তপোবন সমাচ্ছন্ন; তাই চাহিতেছি—বাত্যার ঘূর্ণা গতি! তাই বৈশাখের আবাহন! বৈশাখ নূতন ত বটেই! মোহের—ভোগের, বস্তুস্তূপের আবর্জ্জনাকে ভস্মীভূত করিতে বৈশাখী-বহ্নি জ্বলিয়াছে। ইহাই হরকোপানল—কাম ইহাতে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

পুণ্যি-পুকুর

কুসুমস্তবকে ভোরের আঁধার তখনও ঘুমাইয়া আছে, দোয়েল তখনও তাহার প্রভাতী গীতি গাহে নাই, উষার অধরের রক্তরাগ তখনও বালিকা বধূর লজ্জাজড়িত মুখখানির মত অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে আবৃত; সাতবছরের মেয়ে শয্যা ছাড়িয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিল,—"মা, ফুল তুলি গে!"

যে স্নেহপুত্তলিকাকে কত আদরের আবাহনে ঘুম ভাঙ্গাইতে হয়, সে আজ নিজে কত আগ্রহে, উৎসাহের আতিশয্যে শশব্যস্তে ডাকিল,—"মা, ফুল তুলি গে!"

আজ বৈশাখ মাস,—আজ 'পুণ্যি-পুকুর' ব্রতের আরম্ভ। তাই নিশি অবসান না হইতেই কন্যা মাতাকে ডাকিল, "মা, ফুল তুলি গে।" তাহার পর পুষ্পচয়ন। কালী, দুর্গা, উমা আসিয়াছে, জমিদার-দুলালী অপরাজিতাও সাজি হাতে উপস্থিত। ঘোষেদের ঝি 'দাসীর মায়ের দাসীও' মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে তাহার মায়ের সঙ্গে কাজে না গিয়া ইহাদের সঙ্গী হইয়াছে। আজ যে সকল মেয়েরই 'পুণ্যি-পুকুর।"

গ্রামের সকল অবস্থার, সকল স্তরের লোকের কন্যার সাথে মেয়ে ফুল তুলিয়া আসিল। টোস্ট, চা-ও চাহিল না, ওভাল-

টীনের' জন্যও ব্যাকুল হইল না! কিম্বা ইংরেজী পুস্তকের পাতা খুলিয়া-সফরিজেট রমণীরা কেমন করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া নারী-জাগরণের পরিচয় দিতেছে, তাহাও পড়িল না। পুণ্যি-পুকুরের মন্ত্র উচ্চারণ করিল :—

"পুণ্যি-পুকুর পুষ্পমালা,
কে পোজে রে সকাল বেলা।
আমি সতী পুণ্যবতী,
সাতভায়ের বোন ভাগ্যবতী॥"

সকাল বেলা। বালিকার খেলার জন্য আকুলতা নাই, ক্ষুধার তাড়না নাই, হারমোনিয়মের চাবি খুলিয়া 'আঁখি মোর ঘুম না জানে' বলিয়া সঙ্গীত-চর্চ্চার চেষ্টাও নাই। বালিকা শ্রদ্ধা-সমাহিতচিত্তে তাহার ব্রতের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে :—

"দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব,
কুন্তীর মত বাড়ুনী হব,
সীতার মত সতী হব।"

নারীজীবনের সর্ব্বোত্তম আদর্শ, যাহা শ্রেয়ঃ ও সত্য, যাহা মঙ্গলে উজ্জীবিত—তাহাই আছে। ইহার নাম শিক্ষা। আর্য্যের কন্যা-শিক্ষা। শিক্ষা একটা ব্রত। তাই ব্রতের আচরণে মন্ত্রদান :—

"কৌশল্যার মত মা হব,
রামের মত ছেলে পাব।"

কন্যা 'পুণি পুকুর' ব্রত করিতেছে বলিয়া মনে পড়িয়া গেল, কোন্‌টা ভাল ? এই পুণ্যি-পুকুর, গো-কাল, সাঁজপূজুনী ? না ঐ লরেটো-বেথুনের কেতাবতী (Alphabetical) শিক্ষা ! কন্যা তখনও মন্ত্র পড়িতেছে ঃ—

"স্বামীর কোলে পুত্র দোলে,
মরি যেন একগলা গঙ্গার জলে !"

বর্ত্তমানের মার্জ্জিত (?) শিক্ষা, তাহাতে প্রেমের একনিষ্ঠা ঘুচাইয়া দিয়াছে। নরনারীর সম্বন্ধে পবিত্রতা, প্রেম ও প্রীতিস্পর্শ, অনুরাগের ঐকান্তিকতা, সেবার আদর্শ, আত্মবিলয়ের আকাঙ্ক্ষা, কিছুই থাকে না। থাকে শুধু, নিতান্ত অধোস্তরের মিথুনরাগ—যৌন-আকর্ষণ ! তাই পতিপত্নীর মাঝে এত ডাইভোর্শের বাহুল্য। এত লজ্জাজনক পরিবাদের বাড়াবাড়ি, এত অশান্তির আধিক্য।

ইহা ত গেল এক দিক দিয়া। আর এক দিকে বর্ত্তমানের নারী-শিক্ষা ভোগবহ্নিতে নিত্যই ইন্ধন যোগাইয়া সংসারকে মরুভূমি করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষা-দুষ্ট অভিজাত শিক্ষিতের বিলাসী কন্যার সাথে আমার কন্যাও পড়িতে গিয়া পড়া যত শেখে, তদপেক্ষা বেশী শেখে—কেমন করিয়া ব্রুচ আঁটিতে হয়, কোন্ কাটারের বাড়ীর ব্লাউজ পরিলে আধুনিকতার সম্মান রক্ষা হয়। যে মা-বাপ হীরার হেয়ারপীন্ দিতে পারে না, তাহার আবার মা-বাপ হওয়া কেন ইত্যাদি। ইহার উপর মেয়েদের মাঝে তারতম্য—হেয়তা-জড়িত অবজ্ঞার ভাব আসে ! বাড়ির মোটরে যে স্কুলে

আসে না বা আসিবার সৌভাগ্য যাহার নাই, সে ত কৃপার পাত্রী। ইহা লইয়া আর তর্ক করা চলে না, ইহা আধুনিক দিনের নিত্যকার ঘটনা।

আধুনিকের সহিত সনাতনের যখন তুলনা করিতে গিয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছি, তখন আদরিণী কন্যা আমার মন্ত্র পড়িতেছে ঃ—

"সীতার মত সতী হব।"

কুক্কুরে যেমন যজ্ঞের হবিকে উচ্ছিষ্ট করিতে দ্বিধা করে না, তেমনি একদল ফিরিঙ্গীর উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাস "সতীত্ব নারীত্ব নহে" বলিয়া পৈশাচিক অট্টরব করিতেছে। ইহার পশ্চাতে দুইটা কথা আছে। প্রথম—মহীলতা আলোক সহ্য করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ফেরঙ্গ দুষ্প্রবৃত্তি। মনুষ্যত্বকে বলিদান দিবার নারকীয় ইচ্ছা। সীতার মত সতী হওয়াই নারী জন্মের চরম আদর্শ। সতীত্ব—সমগ্র মানবতার এক পরম সম্পদ। ফেরঙ্গ জাতি যাহা করে করুক; ভারত-কন্যা তাহার জীবনের প্রথম উন্মেষের সঙ্গেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে " সীতার মত সতী হব"।

ভারতে আবার যদি সীতার মত সতীত্ব-তেজ-বিস্ফুরিত হইয়া উঠে, তবে এই দাসত্বের দুর্দ্দিন অচিরেই ঘুচিয়া যাইবে।

জ্যৈষ্ঠি-মাস

পল্লীর শ্যামল বনবক্ষ হইতে পাকা আমের গন্ধ ভাসিয়া আসিল। ঐ মিষ্ট, ঐ মধুর-স্বাদু গন্ধ মাতৃ-আহ্বান। পাকা আমের গন্ধে প্রতিরণিত হইতেছে—'ফিরে আয়! ফিরে আয়! ফিরিয়া আয় মায়ের কোলে! ফিরিয়া আয় পল্লীর শ্যামল বক্ষে! ফিরিয়া আয় নিজস্বের সর্ব্বস্বের মাঝে!'

পাকা আমের গন্ধ মাতৃ-আহ্বানের প্রতীক। ডাক শুনিতে জানিলে পত্রের মর্ম্মেরও শোনা যায়; পাকা আমের গন্ধেও মায়ের স্নেহসুরভিত আহ্বানকে অনুভব করা যায়। পাকা আমের গন্ধে মায়ের ডাক শুনিতে পাইলে দরদীয়া ও মরমিয়া হইলে মাকে চিনিতে পারিব, মায়ের কোলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতৃসেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হইব।

প্রত্যাবর্ত্তন—একটা বিজয়-অভিযান। বহির্ম্মুখী মনকে বাহিরের সর্ব্বস্ব হইতে প্রত্যাহার করিয়া লইয়া অন্তর্ম্মুখী করিতে পারিলে জাতির অন্তরে মহাশক্তি স্বতঃই জাগ্রত হইবেন। প্রত্যাহার—আজিকার ধর্ম্ম, বিজয়-সম্পদ লাভের কৌশল! বহির্ম্মুখিনতাই ত, আমাদের মরণের দিকে লইয়া গিয়াছে। পল্লীর আম্র-কাননের মধুর স্নেহবন্ধন বিমুক্ত করিয়া যখন নাগরিক হইবার মোহে বাহিরের

দিকে ছুটিয়াছিলাম, তখন হইতেই ত স্বহস্ত-সজ্জিত শ্মশান-চুল্লীর দিকে মরণযাত্রা করিয়াছি। বিদেশী ও বিলাতী বহির্ম্মুখিনতার বিষময় পরিণাম। পাকা আমে অনুরাগ থাকিলে আজ জ্যাম-জেলিতে ভারতের আপণ-বিপণী ভরিয়া রহিত না !

"আমের রসি, খাই না খাই গায়ে ঘষি"—এই শ্লোক পিতামহ প্রপিতামহগণের মুখে শুনিয়াছি। আমের রসকে তাঁহারা সর্ব্ব দেহমন দিয়া পাইতে চাহিতেন ! তাই তাঁহারা পল্লীতেই বাস করিতেন ; মোচার ঘণ্ট, থোড়ের ডাল্‌নায় পরিতুষ্ট হইতেন, মুড়ি নারিকেল নাড়ুতে তৃপ্ত থাকিতেন, ক্ষীরোদ গরদ-তসরে বিলাসবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। অর্থাৎ স্বস্থ থাকিতেন, সুস্থ থাকিতেন, স্বাধিকারে সন্নিবিষ্ট রহিতেন। তাই রাষ্ট্রের উত্থান পতন তাঁহাদের পল্লীর সুমধুর জীবনকে উৎখাত করিতে পারে নাই।

পল্লীর বনবীথির বক্ষ নিঙাড়িয়া পাকা আমের সুমধুর গন্ধ জীবন-মনকে প্রমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। এই গন্ধে প্রত্যাবর্ত্তনের একটা দিব্য আহ্বান সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যাবর্ত্তন—ফিরিয়া আসা—প্রত্যাহার। যেখানে যেমন ছিলাম, সেইখানে তেমনি ভাবে অধিষ্ঠিত হওয়া। ইহাই দিব্য-কর্ম্ম, দিবা-সাধনা, জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম !

কমঠবৃত্তি একটা শাস্ত্রীয় সাধনা। কূর্ম্মের মত নিজের আচ্ছাদনে আবৃত হইলে বিনাশ ভয় রহিত হয়, আত্মরক্ষার একটা অপরাজেয় সামর্থ্য জন্মায়। বাহিরের উপদ্রব জীবনসত্ত্বাকে উপদ্রুত করিতে

পারে না। এই কমঠবৃত্তিও একটা সংগ্রামনীতি—আত্মরক্ষার অব্যর্থ কৌশল। পাকা আমের গন্ধে এই জন্যই মজিয়া রসিয়া উঠিতে চাই। ভিনোলিয়ার সৌগন্ধ-বিভ্রান্ত চিত্তকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া পাকা আমের গন্ধে মোহিত হইতে পারিলে কমঠ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব। মনে রাখিতে হইবে কমঠ-সাধনা—স্বাধীনতা-সংগ্রাম। যাহা হারাইয়া গিয়াছে, যাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যাহা উন্মার্গগামী হইয়াছে, তাহাকে কুড়াইয়া ফিরিয়া পাইবার সাধনাই কমঠবৃত্তি—প্রত্যাহার-সাধনা।

মাথার উপরে ব্যোমযান মৃত্যুবাণ বহন করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে কালানলবর্ষী সমরপোত ভ্রূকুটী-ভঙ্গী করিয়া রহিয়াছে, চতুষ্পার্শ্বে, সম্মুখে পিছনে রক্তচক্ষুর অনল-বর্ষণ, বন্ধনের লৌহবেস্টনী দিনের পর দিন তাহার নাগপাশ বন্ধনকে বিসর্পিত করিতেছে; তবুও বাঁচিতে চাই, স্বরাজ চাই, স্বাধীনতা চাই! বিবস্বান সূর্য্যের দীপ্তিতে আর্য্য-জীবন, আর্য্য-সভ্যতা সাধনাকে প্রকট করিতে চাই।

এই দিব্য আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধির জন্যই প্রয়োজন হইয়াছে—প্রত্যাহারের। ফিরিয়া আসা, সঙ্কুচিত হওয়া নহে; যে শক্তি, যে সামর্থ্য, জাতির যে বীর্য্য-বিভব বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়া স্বল্পতেজ হইয়াছে, প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেই তেজোবীর্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়া পুনরায় মহাশক্তির জনক হইবে।

পাকা আমের গন্ধ একটা ছলনা, একটা অবলম্বন, নিজস্বের

প্রতি অনুরাগ উদ্দীপনের একটা আশ্রয়। ও-ডি-কলোন, অটো-ডি-রোজ যে দিন হইতে ভারতীয় চিত্তকে অভিভূত করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ত পাকা আমের গন্ধ ভাল লাগে না। সেই দিন হইতেই ত পল্লী-যুবক, পল্লী-বৃদ্ধ, অনুরাগের আতিশয্যে গাহিয়া উঠে না—"আমের রসি, খাই না খাই গায়ে ঘষি।"

বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের কথা কহিয়াছি। এই মন্ত্রের মর্ম্মে আত্ম-অনুরাগের প্রেরণা ও স্পর্শ রহিয়াছে! বন্দেমাতরম্—আমার মা—আমারই মা! তোমার মা—আমার মা নহেন। তোমার মা রাজরাজেশ্বরী সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি আমার মা নহেন। ইহাই "আমের রসি, খাই না খাই গায়ে ঘসি।" আমি আমার মা ছাড়া আর কিছু বুঝি না, জানি না, আর কাহাকেও ভক্তি করিতে, ভালবাসিতে পারি না।

ইহার নাম দরদ—আত্মপ্রীতি। ইহাই আত্ম-উৎসর্গের উদ্দীপক, আত্মপ্রতিষ্ঠার নিয়ামক। এই দরদ জন্মিলে আত্মরক্ষার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে, আবার আপনাকে পরিশোভিত, পরিবর্দ্ধিত করিবার প্রেরণা জাগরুক হয়।

তাই জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্নে পাকা আমের গন্ধকে সমগ্র জীবন-মন দিয়া গ্রহণ করিতে চাহিতেছি। যে মন দেশের প্রতি বিরূপ হইয়া পড়িয়াছে, সেই মনকে স্বদেশের অনুরাগের রসে অভিষিঞ্চিত করিতে চাহিতেছি। দেশ-প্রেম ও দেশ-সেবার কথা বলি, কিন্তু সত্যই কি দেশকে চিনি, বুঝি, ভালবাসি, ভক্তি করি? করি না।

করিলে প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া 'ডে-লাইট' জ্বালাইতাম না, চন্দনপঙ্ক ফেলিয়া রাখিয়া পমেটম-রুজ মাখিতাম না, পল্লীর শ্যামল অঙ্ক ছাড়িয়া নগরের প্রস্তর-নির্ম্মম আবেস্টনে আছড়িয়া পড়িতাম না। ভারতের হাটে বিলাতি বিকায় শুধু বিদেশী বণিকের লোভাতুর প্রবৃত্তির বশে নহে; বিকায় আমাদের বিলাতীয়ানার মোহে, আত্ম-দ্রোহের ফলে!

আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা করি। তাই আপনার রসে মজিয়া উঠিতে চাই। ইহারই নাম—"আমের রসি, খাই:না খাই গায়ে ঘষি!" জ্যৈষ্ঠমাস,—আম পাকিয়াছে। পাকা আমের মধুর গন্ধ পবন-হিল্লোলে বহিয়া আসিয়া আমাদের আহ্বান করিতেছে—ফিরিয়া আয়! ফিরিয়া আয়!! চল, এই জাতীয় জাগৃতির মাহেন্দ্রক্ষণে মায়ের কোলে ফিরিয়া যাই। আত্মপ্রতিষ্ঠ হই।

———

আষাঢ়

বিরহী যক্ষ, না বিরহী বাঙ্গালী! অভিশপ্ত যক্ষের কেবল প্রিয়া-বিরহ ঘটিয়াছিল, আমরা যে সর্ব্বস্বহারা হইয়াছি। আষাঢ়ের প্রথম ভাগে আমরা কাঁদিব, আষাঢ়ের সজল জলদের অজস্র বারিসম্পাতের মতই কাঁদিব—কাঁদিয়া যদি বাঙ্গালার সমস্ত মালিন্য ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারিতাম! পানিপথের পলাসীর পাপ যদি এই ক্রন্দনের অশ্রুপ্রবাহে প্রক্ষালিত হইয়া যাইত এবং সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত যে বিদেশীয়ানার ক্লেদ মাখিয়াছি, তাহাকে যদি ধুইয়া নিশ্চিহ্ন করিতে পারিতাম, তবে ক্রন্দনের একটা সার্থকতা থাকিত। অসমর্থের ক্রন্দন—কাঁদিতে ইচ্ছা হয় না।

বিরহই ত বটে! মিথুন জীবনের বিরহ-ব্যথা কতটুকু! আমাদের যে সর্ব্বস্ব গিয়াছে। গৌড় সপ্তগ্রাম গিয়াছে। বাঙ্গালী লাঠিয়ালের লাঠি গিয়াছে। বৈষ্ণব কবির মত সেই স্বর্গীয় মনীষার রশ্মি নিভিয়া গিয়াছে। টাকায় ৮ মণ চাল ও দুধ ঘি ছানা গিয়াছে। গিয়াছে মুখের হাসি, বুকের বল! প্রভাতে মঙ্গলারতি ও সন্ধ্যায় আরত্রিক—তাহাও গিয়াছে। কুবেরের ঐশ্বর্য্যের মত সেই সম্পদ,—তাহাও আজ নাই! রাজলক্ষ্মীও নির্ব্বাসিতা! বিরহের পরিমাপ হয় কি?

শুধুই কি বিরহ? ক্রন্দন ও উচ্ছ্বাস? বাঙ্গালার মৃত্তিকাই কি সজল শ্যামল? বাঙ্গালার আকাশে কি বজ্রের বিলসন হয় না? ধীর-সমীরে লবঙ্গলতিকাও ধীরি ধীরি দুলিয়া থাকে, আবার ঈশানের কোল হইতে প্রভঞ্জনও প্রলয়ের স্পর্শ লইয়া প্রবাহিত হয়। যে বাঙ্গালায় দোয়েল শ্যামার কূজন-কাকলীতে বনস্থলী আনন্দিত করে, সেই বাঙ্গালার অরণ্যবক্ষেই প্রত্যক্ষ মৃত্যুতুল্য শার্দ্দূলের গর্জ্জন শুনিতে পাই। বাঙ্গালা শ্যামা, বাঙ্গালা ভীমা! তাই ভাবিতেছি, আষাঢ়ে ঝুরিব, না জ্বলিব। মেঘে বিদ্যুৎ খেলাইয়া, বজ্র জ্বালিয়া, প্রলয়ের ধারা প্রবাহিত করিয়া আষাঢ়ের মত প্রমত্ত প্রচণ্ড হইয়া উঠিব; না, কল্পনার লীলায় মাতিয়া উঠিব?

আষাঢ় মনে পড়িলে কত কথাই না মনে পড়ে। মনে পড়ে —কালিদাসের সহিত নবরত্ন! মনে পড়ে বিক্রমাদিত্য ও উজ্জয়িনীর আলোকিত রাজসভা। মনে পড়ে স্রগ্ধরা, মালিনী ও মন্দাক্রান্তার ছন্দলীলা! কুরুবক, অশোক ও লোধ্র কুসুম-মুঞ্জরিত কুঞ্জকানন। কালিদাসের কথা কহিলে ভারতের সেই স্বর্ণযুগের স্মৃতিই মনকে আকুলিত করে। আর কি কিছু মনে হয়? হয়—রঘুর দিগ্বিজয়। স্বর্গমর্ত্ত্য ত্রিলোকের অধীশ্বরত্ব! একটা অপরিমেয় মহিমা ও শক্তির গরিমা। তাই ভাবি, আষাঢ়ে বিরহীর মত কাঁদিব, না বজ্রজ্বালায় জ্বলিয়া উঠিব!

কাঁদিতে পারিলে হইত; কিন্তু কাঁদিতে পারি কই! সেই রেবাতটে উজ্জয়িনীর প্রতি আর মমতা কই! অযোধ্যার প্রতি আর

সে আকর্ষণ কই ! কুরুবক চম্পক কাটিয়া ফেলিয়া সেখানে ক্রোটন রোপণ করিয়াছি। মেঘদূত—ম্যামথের অবশেষের মত একটা প্রত্নতাত্ত্বিক বিস্ময় হইয়া রহিয়াছে। আজ কালিদাস নয়, হুইটম্যান। মেঘদূত নহে, ঘাসের পাতা (Leaves of grass)। যাহার জন্য কাঁদিব, সেই যে আমাদের মন হইতে নির্ব্বাসিত। শকুন্তলা নহে, দেস্‌দিমোনায় যে আজ আমাদের অনুরাগ উথলিয়া উঠে। মেঘদূত রচনার প্রেরণা কই ? কাঁদিবার মত আত্মপ্রীতি কোথায় ? আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, নিজস্বতার প্রতি যে মমতা থাকিলে হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়নের উৎসমুখে অশ্রু উৎসারিত হইয়া আসে, তাহা যে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কাঁদিবে কে ও কাহারা ?

কাঁদিতে যদি পারিতাম, তবে হারানিধি হয় ত ফিরিয়া পাইতাম। তাই আষাঢ়ের স্মৃতিকে উদ্বোধিত করিয়া কাঁদিতে চাহিতেছি। চাহিতেছি, হৃদয়-আকাশে মমতার ধারাবর্ষণকারী যে মেঘ বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই আবাহন করিয়া প্রীতির ধারা বর্ষণ করিতে। হে নব মেঘ ! হে আষাঢ়ের ঐশ্বর্য্য ! হে বারি ও বজ্রবর্ষণকারী মেদুর-ভীষণ ! আমরাও অভিশপ্ত, আমাদের প্রিয়ের বারতা দাও,—দাও আমাদের বিগলিত করিয়া।

রামচরিত কাব্য। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী কবিতাচ্ছলে জাতির ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। রামচরিতে বাঙ্গালার রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস আছে। নব্যযুগের বাঙ্গালী কাব্যও লেখে নাই, ইতিহাসও রচনা করে নাই। যাহা গিয়াছে,

তাহাকে যদি আজ কাব্যের রসায়নে রসসিক্ত করিয়া জাতির কাছে ধরিতে পারিতাম, তবে হয় ত দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়া উঠিত। বাঙ্গালার ইতিহাস কেহ লেখে নাই, বাঙ্গালা কাব্যও কেহ রচনা করে নাই। করিলে বিরহ-বেদনা যে উদ্বেল হইয়া উঠিত না, এমন নহে। নব্য বাঙ্গালায় আর একটা সন্ধ্যাকর নন্দী জন্মাইল কই ?

অবতারের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য—দুঃখ দূরীকরণ—ধরার ভার-হরণ। দুঃখের উগ্র অনুভূতি চাই। তবেই অবতরণ সম্ভব হয়। গত কয় শতাব্দীতে আমরা আমাদের হারানো রত্নের জন্য বিরহের জ্বালা বোধ করি নাই। বরং উল্লাস প্রকাশ করিয়াছি। স্বর্ণ-পল্লী শ্মশান হইয়াছে, আমরা সহরে মিউনিসিপ্যালিটী প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম উল্লাস প্রকাশ করিয়াছি! শ্যামলী ধবলী মরিয়াছে, কন্‌ডেন্স মিল্ক আনাইয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছি। বিরহও নাই, তাহার ব্যথাও নাই।

আষাঢ়ের মেঘ-মেদুর দিনগুলি দেখিয়া কালিদাসের যুগের সেই কান্ত কমনীয় দিনগুলির কথা মনে পড়িবে না কি ? মনে পড়িয়া বেদনার অশ্রু নয়নে উথলিয়া উঠিবে না কি ? দুঃখের অনুভূতি হইলে মুক্তি হয়। দুঃখ কোথায় ? বেশ আছি। ইংরাজী শিখি ও শিখাই। উজ্জয়িনী না থাক, দার্জ্জিলিং সিমলা আছে। কালিদাস না থাকুক, কবি তরুণকান্ত আছে—হুইটম্যানের ভারতীয় সংস্করণ! সিপ্রা না থাকুক,—বাথ-রুম আছে! নবরত্ন সভা না-ই বা রহিল,

'বার লাইব্রেরী' ত গোকুলে বাড়িতেছে! দুঃখ কোথায়? খাই না খাই, মামলা করি; ভিটে থাক না থাক, বাবু হই! দুঃখ থাকিলে আজ ভারত-সমুদ্র উথলিয়া ভারতকলঙ্ক মোচন করিয়া দিত!!

কান্তা-বিরহ-বিধুর আমরা, তাই আজ আষাঢ়ের প্রথমে কাঁদিতে চাই, বর্ত্তমান দুঃখের জন্য কাঁদিতে চাই! বিগত-বেদনা—রঘু নাই, রঘুর সে দিগ্বিজয় নাই। বর্ত্তমানের বেদনা—আমরা নাই,—আমাদের সে স্বকীয় মহিমা নাই! নিজস্বতার দীপ্তি নাই!!

মেঘের বুকে তড়িৎ খেলে, বজ্র জ্বলে—মেঘে আলোড়ন আসিলে! আমাদের বক্ষ যদি দুঃখের আলোড়নে আলোড়িত হয়, তবে সেখানে বজ্রও জ্বলিয়া উঠিবে। আষাঢ়ে তাই বিরহ-ব্যথায় আলোড়িত হইতে চাহিতেছি।

———

স্নানযাত্রা

বিরাট ও অবিশেষ যিনি, যিনি নাম ও রূপের অতীত অনন্ত পুরুষ, তাঁহাকে আজ আমরা স্নান করাইব। হিন্দুর স্পর্দ্ধা ও শ্লাঘার আজ পরিমাপ কর। যিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌, তাঁহাকে বারিধারায় সিঞ্চিত করিয়া স্নিগ্ধ করিব। কি বলিষ্ঠ চিত্তবৃত্তি, কি অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা! বিরাটের পূজারী আমরা, বিরাটই আমাদের আচরণ!

ভগবানকে যাহারা স্নান করায়, তাহাদের হৃদয়-বলের, বলবত্তর চিত্তবৃত্তির, শুভতর কল্পনার, স্বর্গীয় আদর্শের পরিমাপ করিতে হইবে বই কি! পরিমাপ করিবার প্রয়োজন বর্ত্তমান জাতীয় চিত্তের অধোগতি দেখিয়া। সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকে যাহারা মর্ত্ত্যের মাঝে আকর্ষণ করিয়া ভক্তির বারিধারা-সেচনে অভিষিক্ত করে, তাহারা আজ পদবী-লোভে কাঙ্গাল, তাহারা কাচখণ্ডের প্রত্যাশী, তাহারা মৃত্তিকাখণ্ডের জন্য মোকর্দ্দমা করিতে কুক্কুরের মত কামড়া-কামড়ি করে, তাহারা অসুরের মত সুরাপায়ী হয়, দাস্যের বিলাসে মজিয়া নিজস্বের সর্ব্বনাশ করে, জননী জন্মভূমির অন্নজলে পরিপুষ্ট হইয়া জননীর নয়নে অশ্রুধারা ঝরাইয়া দেয়। যাহারা একদিন ঘোষণা করিয়াছে, "নাল্পে সুখমস্তি,"

তাহারাই আজ অম্লের, তুচ্ছের অভিলাষী! আজ স্নানযাত্রার দিন বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানকে স্নান করাইয়া যদি বৃহতের উপাসক হইতে পারি, তবেই মানবজন্মকে সার্থক জ্ঞান করিব।

ভগবান রসস্বরূপ। যাহা কিছু সুন্দর, শোভন ও শ্রীসম্পন্ন;—যাহা কিছু আনন্দে লহরিত,—যাহা কিছু প্রীতিপ্রদ, তাহাই ভগবান। এই সব আনন্দ, শ্রী ও রস মর্ত্ত্যের কিছু নহে। তাহা কামলোকের অতীত, তাহা ভোগস্পৃহার বাহিরে। সেই জন্য হিন্দুর উৎসবের আনন্দ,—কামমত্ত নর-নারীর আশ্লেষ-চুম্বনের চিত্র তুলিয়া বায়স্কোপ দেখায় নহে, পরন্তু ভগবানকে স্নান করাইয়া। যিনি সমগ্র রসের উৎস, তাঁহাকেই হৃদয়ের ভক্তি-সরিতে অবগাহন করাইয়া!

আর্য্য জাতি আদর্শভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অমৃতের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকার ভিখারী হইয়াছে। তাই আজ ভারতের হাটে পোর্সিলেন ও কাচের পাত্র; সেই জন্যই দুধ-ঘি খাইবার পয়সা দিয়া দেশবাসী মদ ও গাঁজা কিনিয়া খায়। তীর্থযাত্রার পুণ্য অভিযান বিস্মৃত হইয়া মোটরবিলাসী হইয়া হা'ঘরের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। বেদবিদ্যা—অমৃতলাভের বিদ্যা! সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানকে অবহেলা করিয়া যে ইংরেজী শিক্ষায় মাতিয়াছি, উহার কারণ স্বল্পপ্রাণতা—"ভূষি পেলে খুসী থাকি।" যে আনন্দ একদিন উদ্বোধিত হইয়াছিল ভগবানকে স্নান করাইবার উল্লাসে, আজ তাহা পরানুকরণের অনুচীকির্ষায়, ফিরিঙ্গী সাজিবার প্রমত্ততায় উন্মত্ত।

স্বাধীনতা হিন্দুর মত কে চাহে! হিন্দু আত্ম-বিলাসী, আত্ম-স্পর্দ্ধিত বলিয়াই ঈশ্বর ছাড়া অপর কাহারও শিরে অভিষেক-বারি বর্ষণ করে না। যে শির ভগবানের চরণে লুটাইয়াছ, তাহা সামান্য মনুষ্য-পুত্রের পায়ে অবনমিত করিও না। এই জন্যই স্নানযাত্রা—অনন্তের শিরোদেশে অভিষেকের শ্রদ্ধাবারি বর্ষণ!

স্নানযাত্রার একটা পারমার্থিক দিক আছে, আবার একটা রসবোধের দিকও আছে। মেদুর মেঘে সুনীল আকাশ আবৃত; রিমিঝিমি করিয়া বাদলের ধারা নামিয়াছে, শিখির নর্ত্তন, কেতকীর প্রস্ফুটন, শীকরশিক্ত সমীরণের সুস্নিগ্ধ শিহরণ, নির্ঝরের কলনর্ত্তন, শ্যামায়িত ধরণীর শ্যামলিমার শ্যামলদর্শন; প্রাণে যে ওই গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন, উহার সাথে হৃদয়ও দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে! একটা অচেনা আকাঙ্ক্ষা জীবন-মনকে চঞ্চল করিরা তোলে, "ভরা বাদরে" * * * মর্ম্মের "শূন্যমন্দির" তাহার বিকট শূন্যতায় হাহাকার করিয়া উঠে। এই বুভূক্ষা, এই শূন্যতার ক্ষুধা—"কিং ন করোতি পাপং"। আর্য্যচিন্তা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াই বর্ষার প্রারম্ভে "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" বিরহী জীবনের বুভূক্ষাকে অনন্তের মহিমার মাধুর্য্যে,—বিরাটের রসের মনোহারিত্বে পরিপূর্ণ করিবার দীক্ষা দান করিয়াছে। ইহাই ত স্নানযাত্রা! নহিলে আপ্তকাম বিরাট যিনি—তাঁহার আবার স্নান কি?

স্নানযাত্রার পার্ব্বণ আছে বলিয়াই 'ডাল'-হ্রদে ডাহুক-ডাহুকির মত হিন্দু নর-নারী সন্তরণ করিয়া বেড়ায় না; সুইজারল্যাণ্ডের

হ্রদে হ্রদে হংস-হংসীর মত যৌন আনন্দে মজিয়া থাকে না! স্নান-যাত্রার পার্ব্বণের অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি বলিয়াই সহস্র উৎপীড়নেও মরি নাই এবং মরিব না।

নিজের দিক দিয়া নিজেকে দেখিতে হয়। বাঁচাও নিজের দিকের, মরাও আপনার দিকের। "তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ" —ইহারই নাম নিজের দিক।—আর্য্য-শির শুধু ভগবানের চরণেই অবলুণ্ঠিত করিব। সবিতৃ-দেবতাকে—যে দেবতা প্রতিদিনকার উষায় প্রাচীর যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্জ্বালিত করিয়া দেন, সেই অনন্ত দেবতাই, সেই বিশ্ববিধাতাই আমাদের ভারতীয় জীবনের নিয়ামক,—প্রভু, সুহৃদ্। আমাদের দুর্গতিও তাঁহার ইচ্ছায়, আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলেই আমরা স্বাধীনতা পাইব,—স্বরাজ লাভ করিব।

ভগবানকে, পুরুষোত্তমকে—যাহারা স্নান করাইতেছে, তাহারা কি তুচ্ছের দাসত্ব করিতে পারে? পারে না! পারে না বলিয়াই আজ আবার উপেক্ষিত আত্মশ্লাঘাকে উদ্বুদ্ধ করিতে শ্রদ্ধাভরে জগন্নাথের শিরোদেশে ভক্তির সলিলধারা বর্ষণ করিব। বিরাটের সহিত সংযোগকে নিগূঢ় করিতে পারিলে ঘরের দিকে মন ফিরিবে। বিদেশের—পরের জিনিষের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইবে না। ইহারই নাম জাতীয় সভ্যতা (culture)। বিদেশের সবই যে তুচ্ছ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর! কাচ ও কৌস্তুভ কি এক! সুরা ও অমৃত কি সমশ্রেণীর!! অল্পপ্রত্যাশী হইয়াছি বলিয়াই না এ দেশে বিদেশী বিকায়! শুধু বিদেশী দ্রব্য বিকায় না, বিদেশী আচারও বিকায়!

নহিলে কি সর্দ্দা আইন পাশ হইত! ইংরেজী স্কুলের দুয়ার খোলা থাকিত! সর্ব্বস্ব পণ করিয়া আইন ও আদালতের নিকট শাসন ও বিচার ক্রয় করিতাম? জাতীয় তপস্যার দিক দিয়া জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

নির্গুণ, নিরাকার বিরাট পুরুষকে, আনন্দময় আপ্ত-কামকে স্নানাভিষিক্ত করা একটা কুসংস্কার বলিয়া ঠেলিয়া ফেলিলে চলিবে না। 'মহতোমহীয়ান্—প্রেম ও ভক্তিতে অণোরণীয়ান্।' বিরাটকে বিশাল বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিলে জীবনে শুষ্কতা আসে। সংসারের ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে একটা অশুদ্ধ-প্রবণতা আসিয়া পড়ে। স্বর্গের ভগবান মাটীর মানুষকে কোন সাহায্যই করেন না। ফলে হয়, জীবনে শুধু ভোগ-বাহুল্য। সেই ভোগ আনন্দ হইতে দূরে লইয়া গিয়া মানুষকে সর্ব্বনাশগামী করে। বাথরুমে পিয়ার্স মাখিয়া যাহারা প্রসাধন করে, তাহাদের বিলাস-পিপাসা মিটিল কই?

যাত্রা বলিলে গমন বুঝায়। স্নানযাত্রা ভগবানের দিকে অভিসার। বরষার বারিধারাসম্পাতে যখন চিত্তবৃত্তিগুলি আকুল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখনই ত ভগবানের দিকে অভিসারের সময়। এই ভাগবত অভিসারে প্রণোদিত না হইলে মনোবৃত্তি ব্যভিচারী হয়।

ভগবান প্রভুও বটেন, প্রিয়তমও বটেন। জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা-বেদীতে আজ এই ঈশ্বর ও প্রিয়তমকে অধিষ্ঠিত করিতে চাই। ইহা করিতে পারিলে মানুষের উৎপীড়নে ও আশঙ্কায় আর ভীত হইব

না ; আর ঠুন্‌কো পল্‌কা বিদেশী বিলাসে ঘর ভরাইতে পারিব না, সে ইচ্ছাই হইবে না। "ভোজন করি, আহুতি দেই শ্যামা মাকে" —এই জ্ঞান প্রবোধিত হইলে মদ-গাঁজা খাইতে আর প্রবৃত্তি জাগিবে না। ভগবানের অভিমুখী যাহারা, তাহারা গর্ব্বিত, স্পর্দ্ধিত। তাহারা সমুন্নতশীর্ষ, তাহারা জগতের কোন শক্তির নিকটই অবনমিত হয় না। এই শক্তিবোধের উদ্বোধনের জন্যই ত স্নান-যাত্রা পর্ব্বাহের অনুষ্ঠান করিতেছি।

আকাশে বরষা ঘনাইয়া আসিল। জাতির জীবন-গগনেও বর্ষার মেঘবিস্তারে বর্ষণ ও বজ্রসঞ্চার। ঈশ্বর যে বজ্রের বহ্নি, মেঘের বর্ষণ-শক্তি,—সেই জন্যই ঈশ্বরকে আজ আমাদের অগ্রে চাই !

দশহরা

মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন,—ভারতবর্ষের নবজন্ম হইবে এবং সেই জন্ম দিব্য-জন্ম। ভারতের নবজন্ম হইবার সুদিন নিকটবর্ত্তীও হইয়াছে। এই নব জন্ম—নব রূপান্তর। সনাতন আত্মার নব প্রকাশ, অভিনব ভঙ্গিমা, সজীব জীবন-চাঞ্চল্য, প্রবুদ্ধ অনুভূতি। মহিমার যৌবন-বিকাশের দিনে ভারত যেমন ছিল, তেমনই হইবে। নূতন যাহা হইবে, তাহা যুগের অনুকূল।

নবজন্মের মাঙ্গলিক গীতিই গাহিয়া চলিয়াছি। তাই দশহরা-পার্ব্বণের তত্ত্ব অনুধাবন করিতে যাইতেছি। হিন্দুর পাল-পার্ব্বণ, ব্রত-নিয়ম—তাহার তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের বস্তুগত সাধন-প্রণালী। এই সকল পার্ব্বণের ঐতিহাসিক অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা তাহার সাধনসম্পর্কীয় তাৎপর্য্য সমধিক।

দশহরা বাঙ্গালার জনসাধারণের পার্ব্বণ। ইহা গঙ্গাপূজা। জাহ্নবীর বারি-প্রবাহ হিন্দু চিন্তার নিকট নদীর সলিল-বিস্তার নহে। গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা ভগবতী। এই সলিল-বিস্তার ভাগবত করুণার দ্রবময়ী প্রতীক। জাহ্নবী-সলিলে অবগাহনে মুক্তি, এমন কি দর্শনে ও স্পর্শনে মুক্তি। যাহা ভগবানের চরণ নিঃসৃত, তাহাই হিন্দুর নিকট প্রণম্য ও পূজ্য।

দশহরার কথা কহিতে গিয়া একটু গঙ্গা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। রাজপুত্র ভগীরথের পিতৃপুরুষ ভস্মীভূত। উদ্ধারের প্রয়োজন। পিতৃপুরুষের উদ্ধার—পুত্রের কর্ত্তব্য। ভগীরথের পূর্ব্বজগণ তাঁহাদের অনাচারের ফলেই ভস্মীভূত। ভগবানের করুণা বর্ষিত না হইলে এই অনাচারকৃত ভস্মীভূত মানব প্রাণসম্পদে উজ্জীবিত হয় না। এখানে অহঙ্কার অকৃতকার্য্য। পুরুষকার ব্যর্থ। বরং পুরুষকারের সৃষ্টি একটা অশোভন ও অসংস্কৃত সৃষ্টি হইয়াই দাঁড়ায়। তাই উদ্ধারব্রতী সন্তান একবারে ভগবানের চরণ-সমীপে।

ভগবান গলিয়া যান—মানবের শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে এবং আত্ম-সমর্পণের ফলে ধূলার ধরণীতে বিগলিত হইয়া অবতরণ করেন। আর্য্যের ভগবান ঈশ্বর এবং সেবক। তাঁহাকে সাধনা করিতে হয় এবং তিনিও ধরা দেন। ভারতের ভগবান্ শুধু পরকালের এবং স্বর্গের ভগবান্ নহেন। তিনি ইহকালের সখা, সুহৃদ, মিত্র এবং জীবন যুদ্ধের সারথিও বটেন। হিন্দু ভগবানকে ছাড়িয়া কোন কিছু করে না, করিতে চাহে না। মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্যের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা স্থাপনই—আর্য্য সভ্যতার দিব্য সাধনা।

ভগীরথের পিতৃ-পুরুষ উদ্ধারে তাই গঙ্গা অবতরণ। সেই জন্যই কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণে সারথিরূপে অগ্রসর—শ্রীহরি। হিন্দুকে তাই প্রতি প্রত্যুষে জীবন যাত্রার প্রথম পাদক্ষেপে স্মরণ করিতে হয়—"যৎকরোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনম্।" আর এই সঙ্গে ইহাও অনুধাবন যোগ্য যে, ভাগবত কৃপা প্রবাহিত হইলে

ঐরাবতবাধা তৃণের মত ভাসিয়া যায়। ভস্মও প্রাণ-সম্পদে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। ব্রহ্ম অভিশাপও কাটিয়া যায়।

হিন্দু তাই গঙ্গাকে ভুলিতে পারে না। সুযোগ পাইলেই একটা ডুব দিয়া কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। গঙ্গাস্নান অবগাহন নহে, ভাগবত-ভাবে নিমজ্জিত হওয়া। ভস্মীভূত ত আমরাও। সংসারের বিষ-বহ্নি-স্পর্শে আমরাও ত ছাই হইয়া রহিয়াছি। জীবনের ভস্মস্তূপের উপর দিয়া ঈশ্বরের কৃপা প্রবাহিত করিয়া না দিলে চেতনা যে পশু-চেতনা হইয়া পড়ে। তাই ত পালপার্ব্বণ দেখিয়া গঙ্গায় একটা ডুব দিবার ব্যবস্থা। আজ দশহরা, চল আজ পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর বারি-প্রবাহে দশটা ডুব দিয়া পরমা গতি লাভ করি।

ষাট হাজার সগরসন্তান ভস্ম হইয়াছিল। আমরা যে বিশ কোটী নর-নারী ছাই হইয়া গিয়াছি। মনুষ্যত্বের, তেজোবীর্য্যের ব্রহ্মাগ্নি আমাদের অন্তর হইতে নিভিয়া গিয়াছে। আমরা পরভাব-ভাবুকতার ভস্মস্তূপ। আমাদের জন্যই চাই যে ভাগীরথীর ভাবপ্রবাহ।

বৈশ্বানরের তেজে পুড়িয়া যদি ছাই হইয়া যাইতাম, তবে দুঃখ কিছু ছিল না। এ ভস্ম যে জীবনের অধঃপাতের ভস্ম। আমরা ছাই,—পরস্বতার অনুচিকীর্ষার ছাই, পরানুকরণের প্রলোভনে ভস্ম, ভীতিতে, দাসবুদ্ধিতে ভস্ম, পরস্পর পরস্পরের, ভ্রাতায় ভ্রাতায় হিংসা-দ্বেষে ভস্ম, স্বকীয়তার দীপ্তিদ্যুতি পরিহার করিয়া ছাই!!! যাহাদের বীর্য্যপ্রবাহে কত ঐরাবত-রাষ্ট্র ভাসিয়া গিয়াছে, তাহারা

আজ জীর্ণ, অবসন্ন, অবনমিত, ঐরাবতেরই পদস্পর্শপ্রত্যাশী ! আমরা নহিলে কে দশহরার পার্ব্বণ করিবে ?

পুরুষকারের বলে শক্তিলাভ করা যায়, স্বাধীনতাও লাভ করা যায়। সেই শক্তি ও স্বাধীনতা ঐরাবতের শক্তি—পশু-শক্তি। এই শক্তি ভারতবর্ষের নিকট চিরদিনই অবজ্ঞাত। তাই পিতৃপুরুষ উদ্ধার-ব্রতী ভগীরথকে ভগবানের পাবনী-শক্তিকে বিগলিত করাইয়া মর্ত্ত্যে বহাইয়া আনিতে হয়। ইহাই ভারতের সনাতনী।

একটা সূত্র, একটা উপলক্ষ্য—দশহরা একটা অবলম্বন মাত্র। ভাবোদ্দীপনার একটা আশ্রয়। চলিত কথায় যাহাকে বলে উস্কাণী। একটি কাঠি দিয়া প্রদীপের সলিতা উস্কাইয়া দিতে হয়। এই সব পাল-পার্ব্বণও সেই প্রকার একটা উস্কাণী মাত্র। সংসারের নিত্যকার কর্ম্ম বাহুল্যে ভাবধারা হইতে দূরে সরিয়া যাই। তাই পার্ব্বণের দিনে ভাব ও আদর্শকে উদ্দীপিত করিয়া লই। এই জন্যই হিন্দুর 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে'র ব্যবস্থা।

ভগীরথের ব্রত নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। সে দিনও ছিল, আজও আছে। আজ বরং বৃহৎ করিয়া আছে। সে দিন একজন ভগীরথের প্রয়োজন ছিল, আজ লক্ষ লক্ষ ভগীরথের আবশ্যকতা। আজ মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া তুমি যাইবে, আমি যাইব, তাহারা যাইবে। আজ বিশ কোটি নরনারী আমরা মা মা বলিয়া ডাকিব, আকুল হইয়া আরাধনা করিব। আজ দুঃসাধ্যের দুর্লঙ্ঘ্য শিখর অতিক্রম করিয়া পতিতপাবনীকে প্রবাহিত করিতে আমরা সকলে মিলিয়া যাত্রা

করিব। দশহরার ইহাই ত দ্যোতনা। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের জাগরণ ফরাসী বিপ্লবও নহে, বোল্‌সি-বিদ্রোহও নহে। ইহা ভাগবত শক্তির প্রবোধনা।

বাঙ্গালার পাল-পার্ব্বণগুলি দিন দিন প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। একদিন দশহরায় গ্রামে গ্রামে ভক্তির, শ্রদ্ধার, উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রবাহ বহিয়া যাইত। কত নৈবেদ্য, কত বলি, কত রক্ত-জবার মালা, সঙ, কত যাত্রা-গানই হইত যে, তাহার আর লেখাজোখা ছিল না। ইহাতে বাঙ্গালী বাঁচিয়া ছিল, প্রাণে তাহার জীবন-চাঞ্চল্য ছিল, সমাজের মধ্যে সৌহার্দ্দের প্রবাহধারা ছিল, আর ছিল রস-বোধ ও আনন্দের সাথে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা। দশহরার দিন যখন গঙ্গার এ কূল হইতে ও কূল পর্য্যন্ত জবার মালা ভাসাইয়া সমারোহ করিয়া গঙ্গাপূজা করিতাম, তখনও বাঙ্গালীর লাঠিতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িত! ধনবান বাঙ্গালী পল্লীভবনে পুকুর কাটাইয়া দিতেন, তখনকার বাঙ্গালী এখনকার মত ম্রিয়মাণ হয় নাই।

আজ দশহরা! এস, আজ লক্ষ জবার মালা গাঁথি, ধূপ, দীপ, ঢাক ঢোল বাজাইয়া মায়ের পূজা করি, পতিতোদ্ধারিণীর প্রবাহ-বিস্তারে দশটা ডুব দিই। মা প্রসন্না হইবেন। আবার নব-প্রাণ পাইব।

কচি আমের ঝোল

খড়ো ঘরের গোময়-লেপিত গৃহচত্বরে জননী বসিয়া আছেন,—অন্নের থালা সাজাইয়া! ব্যঞ্জন গাছের ডুমুর, পুকুরের কলমি, আর পাথরের বাটী ভরা এক বাটী কচি আমের ঝোল। কচি আমের ঝোল!—তরলিত স্নেহের স্নিগ্ধ মধুর অভিব্যঞ্জনা! কচি আমের ঝোল—হৃদ্য, উত্তাপজনিত অবসাদের নিরাময়কারক। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সমস্ত পানীয় ও পেয় বস্তুর মধ্যে তৃপ্তিপ্রদ! কচি আমের ঝোল—মাতৃ-আহ্বান।

স্বপ্নই দেখিতেছি কি? শুধু কি কল্পনার স্বর্ণজাল বুনিয়া দুঃখ-দুর্গতির, নির্য্যাতন-নিপীড়নের বেদনা-ব্যথাকে বিস্মৃত হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি? কচি আমের ঝোলকে উপলক্ষ্য করিয়া কি কেবল প্রলাপই বকিতেছি? স্বদেশ-প্রীতির উত্তেজনায় কি উন্মাদ, দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া বাঙ্গালার কানন-বিথারে চ্যুত-মঞ্জরী—যে আম্রফল উপহার দিয়াছে, তাহারই অম্লমধুর আস্বাদনে উৎফুল্ল প্রাণ কচি আমের স্তুতি করিতেছি?

না!!—দেশাত্মবুদ্ধির উদ্রেকে ঐ কচি আমের ঝোলের অম্লমধুর স্পর্শে দিব্য চক্ষু খুলিয়া গিয়া দেশলক্ষ্মীর দিব্যমূর্ত্তির দর্শনলাভ

করিয়া ধন্য হইয়াছি। আজ বুঝিয়াছি—মাতৃস্নেহ অবহেলা করিয়া রাক্ষসী মোহে অভিভূত হইয়াছিলাম। আমাদের ক্ষুধার্ত্ত চিত্তের সম্মুখে স্নেহের নৈবেদ্য কচি আমের ঝোল ছিল না ও নাই; আছে—বোতল ভরা জ্যাম ও জেলি, বিলাতী কৌটায় ভরা বাটার!

কচি আমের ঝোল! এই ধ্বনির স্পর্শেই চিত্তের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল! দেখিলাম—চতুর্দ্দিকে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, মধ্যে পরিতৃপ্ত পল্লী। পল্লীগৃহস্থের উঠানে স্বর্ণগর্ভ মরাই ও গোলা, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী, স্বাদুসলিলা তালপুকুরে বৃহৎ মৎসকুলের সহর্ষ সঞ্চরণ। দেখিলাম—রায়দীঘির পাড়ে বৃহৎ হাট বসিয়াছে। হাটে ধান, চাল, কলাই, নানাবিধ তরিতরকারির সাথে বস্ত্র-শিল্প, কাংস্য-শিল্প, মৃত্তিকা-শিল্প—নানাবিধ শিল্পদ্রব্যের সমারোহ বসিয়াছে—যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! দেখিলাম—জননী কুন্দকুসুমের মত শুভ্র অন্নরাশি পরিবেশন করিয়া—দিতেছেন ঘৃতাঞ্জলি। পার্শ্বে—বাটিভরা দুধ!

দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত। একশত বৎসরের মধ্যে হাট বাট ভাঙ্গিয়াছে, শ্যামলী ধবলী মরিয়াছে, গোলা মরাই শূন্য হইয়াছে। সেই আলিম্পন লেপিত পল্লীগৃহ জীর্ণ মৃৎস্তূপ,—চলিত কথায় —“কাঁতরা”। সুবিশাল হ্রদতুল্য দীঘিতে সে মৎস্য সঞ্চরণ নাই, আছে—কচুরিপানার দল। আর নাই, সেই হৃদ্য-তৃপ্তিদায়ক, রুচি-রোচক—সেই স্নেহমধুর কচি আমের ঝোল! তৎপরিবর্ত্তে আছে —বার্লি জল, কুইনাইন-মিকশ্চার, আর আছে বিলাতী ফুড, বিলাতী

জ্যাম-জেলি। যেখানে ছিল নিজস্বতার মাধুর্য্যের মনোহারিত্ব ও মহিমা ;—সেখানে আছে, পরবশতার কলঙ্কলেপন !

কচি আমের ঝোলে আমরা ছিলাম, আমাদের জননী ছিলেন। ছিল আমাদের জীবনের মাধুর্য্য রস—বাঙ্গালী প্রাণের সরস স্পর্শের জীবন্ত চাঞ্চল্য ! কচি আমের ঝোল কিছুই নহে,—কচি আমের ঝোলই সর্ব্বস্ব।

কেমন করিয়া কি হইল, তাহাই বুঝিতে চাই। দুধের বাটি চোখের জলে ভরিয়া উঠিল কেন ? লক্ষ্মীর স্বর্ণ-নুপুরের শিঞ্জনের পরিবর্ত্তে পেচকের অমঙ্গল ধ্বনি দিবার আলোককে পর্য্যন্ত ম্লান করিয়া তুলিতেছে কেন ? যে বাঁশ বাঙ্গালীর হাতে বজ্রের মত শোভমান ছিল, সেই বাঁশ আজ বাঙ্গালীর বুকে। "বুকে বাঁশ"—বাঙ্গালীর গাল !

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রদীপ্ত প্রভা ! অন্তরে প্রজ্জ্বলিত প্রেরণা—বাঁচিব ! গরিমায় মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া বিশ্বনিখিলে বরণীয় হইয়া বাঁচিব। বাঁচিব কেমন করিয়া ? কচি আমের ঝোলের দিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ও এই জ্যাম জেলিকে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া।

কচি আমের ঝোল—জীবনের অমৃত স্পর্শ—মাতৃমহিমার স্নেহ-সোহাগের আবাহন। বহির্ম্মুখী মনকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া আত্মশক্তির, আত্মপ্রীতির উদ্বোধন ঘটাইলে দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইবে। তাই কচি আমের ঝোলে সমাবর্ত্তনের সম্বোধন-গীতি বাজিয়া উঠিল।

বাঙ্গালীর পরাধীনতা কি ?—পরবশতা। বাবু সাজিবার

দুষ্প্রবৃত্তি। আত্ম-অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাই, ইংরেজী শিক্ষা যে দিন আমাদের ফেরঙ্গ সভ্যতার স্বর্ণমৃগের প্রতি প্রলুব্ধ করিয়াছে, সেই দিনই পরাধীনতার মৃত্যুবাণ আমাদের বক্ষ স্পর্শ করিয়াছে। গুড় মুড়ি, নারিকেল নাড়ুর মিষ্টতা যে দিন আমাদের নিকট অবহেলিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই মরিবার শ্মশানশয্যা স্বহস্তে রচনা করিয়াছি। আজ যদি টোষ্ট রোষ্ট, কেক বিস্কুটে না মজিতাম, যদি আমের ঝোলে চিত্তমন মজিয়া রহিত, তবে তুলাদণ্ড শাসনদণ্ডে রূপান্তরিত হইবার অবকাশ পাইত না।

আমের ঝোল!—দশটায় বাবু সাজিয়া ট্রামে চড়িয়া অফিসে গিয়া ফ্যানের হাওয়া খাইবার প্রলোভন যদি আজ ত্যাগ করি, ইংরেজী স্কুল কলেজে অবিদ্যারূপিণী যে মোহিনী আমাদের গাড়ী ঘোড়া চড়িবার লোভ দেখাইতেছেন, তাঁহার সেই সর্ব্বনাশা মোহের মৃত্যু বেষ্টনী হইতে যদি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আর্য্য বিদ্যার আনুগত্য স্বীকার করি, রিষ্ট-ওয়াচ ব্রেসলেটের আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া যদি খাড়ু-শাঁখায় আবার মন বসে; আবার যদি মেস্ হোষ্টেলের মায়াহীন কবল হইতে মুক্ত হইয়া মেটে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া মাতৃপরিবেশিত অন্নব্যঞ্জন খাইবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হইয়া উঠি, তবে জাহ্নবীর সলিলবিস্তারে যে জননী নিমজ্জিতা হইয়াছিলেন, তিনি আবার বাঙ্গালার স্বর্ণ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন।

কঠিন ব্রত!—অস্ত্র ধরিব না, অথচ পরাধীনতার লৌহ-বেষ্টনী হইতে মুক্ত হইয়া আসিব! নররক্তে জননী বসুধার বক্ষোদেশ

কলুষিত করিব না, অথচ স্বরাজ আমাদের করতলগত হইবে। ছলনা নহে, ব্যথিত মনকে রঞ্জিত প্রবোধে শান্ত করা নহে; স্বারাজ্য ও স্বাধীনতা লাভ করিব—সুনিশ্চিত করিব—কচি আমের ঝোলের সহিত মনখানিকে গলাইয়া দিয়া।

মূঢ় অহঙ্কারে হাসিও না। আজ যদি দত্ত-গৃহিনী শ্বশুরের ভিটায় প্রদীপ দিতেন, স্বামি-পুত্রের কোলে আমের ঝোল দিয়া ভাত পরিবেশন করিয়াই খুসী থাকিতেন; আজ যদি দত্ত-গোষ্ঠীর বংশধর ইংরেজী কলেজের আত্মঘাতী শিক্ষা না পাইতেন, 'দত্ত মশাই' উপাধিতেই গর্ব্ব বোধ করিতেন, তবে নিখিল বাঙ্গালার শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র নেতৃগণকে কারাকক্ষে নির্য্যাতিত হইতে হইত না। কচি আমের ঝোল বলিয়া ঐ জন্যই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছি। ছেলেকে যদি লজেঞ্চুস খাওয়াইবার দুষ্প্রবৃত্তি না করিয়া পকান্ন, সিঁড়ির লাড়ু খাইতে দিতাম, তবে আজ আর সত্যাগ্রহীদের এ অবস্থা হইত না।

বড় উত্তাপ! এক দিকে শাসনের প্রচণ্ড উত্তাপ, আর এক দিকে অন্তরের মাঝে স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্দীপনার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা—কচি আমের ঝোলেই ইহার নিরসন। চল, ইংরেজী শিক্ষা ও নব-নাগরিকতার মোহপাশ বিচ্যুত করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাই! কচি আমের ঝোলে মনকে মজাইয়া ভুলি, জননীর আশীর্ব্বাদে আমাদের স্বারাজ্য লাভ হইবে, সুদিন ফিরিয়া আসিবে। মরিব না, মরিতে চাহি না; পরন্তু স্বরাজ ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াই বাঁচিব। তাই কচি আমের ঝোলে মনকে অভিসিঞ্চিত করিব। কচি আমের

ঝোল ত নহে—মাতৃস্নেহের তরলিত উচ্ছ্বাস! ঐ কচি আমের ঝোলকে উপলক্ষ করিয়াই সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারিত করিতেছি:— আপ্যায়স্ব মমাঙ্গানি, বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুশ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়ানি চ সর্ব্বাণি।" বাঙ্গালার—মাতৃভূমির সর্ব্বস্বে যেন আমরা আপ্যায়িত হই!

অশ্বত্থমূলে

বৈশাখ মাস—কাননে কুঞ্জে চম্পক-চামেলি, মল্লিকা, যুঁথিকার বিকাশ সমারোহ। পুষ্পবীথিকায় যেন উৎসব পার্ব্বণ। কত বর্ণ, কত গন্ধ। কুললক্ষ্মী কিন্তু চলিয়াছেন অশ্বত্থমূলে! অশ্বত্থমূলে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যবারি অঞ্জলিদান করিতে। মালতী, মল্লিকা, চামেলী নহে, চম্পক, শেফালি, কুরুবক নহে—অশ্বত্থ। এক পুষ্পহীন বিরাট বনস্পতি! ইহার ফুল নাই, মাধুর্য্যের মনোহারিত্ব নাই; কিন্তু বিশালত্বের মহিমা আছে! অশ্বত্থের শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া আছে, ইহার আশ্রয় আছে।

বৈশাখ মাসে আর্য্য হিন্দু অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে জলদান করেন। ইহার নাম—বৃহতের উপাসনা মাধুর্য্য—মনোহারিত্ব আছে, কিন্তু মহিমা নাই। মহিমা বৃহৎ ভাবের উদ্বোধন ঘটায়। একটি তরঙ্গ-ভঙ্গিম কলনাদিনী ক্ষুদ্র নির্ঝর-প্রবাহে মাধুর্য্য আছে; মহিমা আছে—বিশালকায় নদী-বিস্তারে। নির্ঝরের কুলুকলনাদে কবিচিত্ত বিমুগ্ধ হয়, কি এক ভাবাবেশ জাগে, এক সুমিষ্ট উপভোগে অন্তর আপ্লুত হইয়া যায়! নদীর উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গী চিত্তের মাঝে এক দার্ঢ্যভাবের উন্মেষ ঘটায়। নদীর জলপ্রবাহ ধরাবক্ষে শস্যের সমারোহ

আনয়ন করে। মানবের জীবন-সম্বল আছে ঐ নদীর সলিল-বিস্তারে। প্রবাহিনীতে মহিমা আছে। মাধুর্য্যের উপভোগের মোহ আছে। কাননে কুঞ্জে বসিয়া নানা পুষ্পের পরিমল স্পর্শে তন্দ্রা আসে, আর বিশাল বনবক্ষে দাঁড়াইলে একটা তেজঃসম্ভারে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে।

অশ্বত্থে জলদান মহিমার উপাসনা। তন্দ্রা না আসে, মাধুর্য্যের মায়াজালে জড়াইয়া না গিয়া যেন জাগ্রত থাকি, এই জন্যই মহিমার পূজা। এই জন্যই বৈশাখের এই মনোহারী প্রাতঃকালে জলঝারি লইয়া অশ্বত্থমূলে উপনীত হইয়া, শ্রদ্ধার প্রতীকরূপী এই জলধারা দান করিতেছি।

চামেলি চম্পক একটা নিমেষের বিশাল বুদ্‌বুদ্। ক্ষণিক, মায়িক। একটা তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়া মল্লিকা ঝরিয়া যায়, চম্পক শুকাইয়া যায়। সেই জন্য চম্পক মল্লিকা চয়ন করিয়া দেবতার চরণতলে সমর্পণ করি, আর নিত্য অশ্বত্থমূলে জলদান করিয়া সারা চিত্ত-মন দিয়া জাগ্রত রহিবার চেষ্টা করি, বৃহতের উপাসনা করি।

"নাল্পে সুখমস্তি।" অল্পে সুখ নাই। তাই আমরা অর্কিডে মজি নাই। ক্রোটনের বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ হই নাই। রঙিন ফুলের রঙ্গের খেলায় বিভোর হই নাই। 'ভূমৈব সুখম্।' সেই বৃহৎ সুখ-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষায় বৃহতের পূজা করিয়াছি। তাই বৈশাখ মাসে অশ্বত্থমূলে জলদানের ব্যবস্থা।

আর্য্য-জাতি মঙ্গল ভাবের উপাসক। শুধু গন্ধ, বর্ণ, শুধু রূপ-বৈচিত্র্য আমরা ভালবাসি না। ভালবাসি না ক্ষুদ্রতার পঙ্কতলে লুটাইয়া থাকিতে। ঘৃণা করি—মোহের উপাসনা করিতে! সেই জন্য প্রজাপতির মত মধুর মায়াকুঞ্জে বিচরণ না করিয়া আমরা যজ্ঞ করি! যজ্ঞের নাম বিসর্জ্জন। উৎসর্গে তাহার অনুষ্ঠান। ভোগ-বিলাসী তুমি, তোমার আছে উপবন। যাজ্ঞিক আমরা, আমাদের আছে অশ্বত্থমূল। অশ্বত্থমূলে জলদানের মহিমার মাহাত্ম্য জানা থাকিলে পতঙ্গবৃত্ত হইয়া আজিকার জগৎকে এমন অশান্তির দাবানল জ্বালা সহিতে হইত না।

প্রজাপতি তাহার ফুলের বক্ষে বিলাস-বাসর যাপন করে। বর্ত্তমান ফেরঙ্গ-সভ্যতা প্রজাপতি-ধর্ম্মী। স্বার্থ-সম্ভোগ ছাড়া ইহার আর কিছু লক্ষ্য নাই। ফিরিঙ্গী জাতি তাই কেবল স্বামী-স্ত্রী লইয়াই জীবন যাপন করে। দানও নাই, যজ্ঞও নাই, বিস্তারও নাই। তাই তাহাদের মধ্যে অর্কিডের এত সমাদর। অশ্বত্থমূলে জলদান তাহাদের বুদ্ধির অগম্য।

আর্য্য হিন্দুর সংসার অশ্বত্থের মত বিশাল—সহস্রের আশ্রয়। আমরা সংসার করি দশজনকে লইয়া। স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের সহিত দশজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়কেও আমরা দুই মুঠা অন্ন দিই! অশ্বত্থের ছায়া, দুর্ব্বার আতপ-তাপে শতেকের আশ্রয়। মিথুন-জীবন পশু-জীবনের রূপান্তর। স্বামী-স্ত্রী লইয়া জীবন-যাপন ইতরজীবেরও স্বভাবধর্ম্ম। আর এই সংকীর্ণতা, এই ক্ষুদ্রতায়

মানবতার অধোগতির সহিত জগৎসংসারেও নানা ভেদ-বিরোধ উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান জগতের অশান্তির মূলে রহিয়াছে—এই ইতরতা।

ইতরতার কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য অশ্বত্থমূলে জলদানের ব্যবস্থা আছে। অশ্বত্থের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত বৃহৎ ভাবের উন্মেষ ঘটে। দশজনের আশ্রয় হইবার সাধ জন্মায়। অশ্বত্থের মত সুবিশাল বনস্পতিরূপে সহস্র শাখা-প্রশাখা লইয়া আতপের ছায়া হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। বাহিরের আচরণ অন্তরকে প্রবুদ্ধ করে।

হিন্দুর ঐশ্বর্য্য একার উপভোগ্য নহে। আমাকে দশকর্ম্ম করিতে হইবে, ব্রতনিয়ম করিতে হইবে, দশ জন আত্মীয়-কুটুম্বের মুখে অন্ন এবং পরিধানে বস্ত্র দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা, তাহাই আমার ভোগ্য। কাজেই আমার প্রতি কাহারো হিংসা বিদ্বেষ নাই। আমি যে অশ্বত্থবৃক্ষ, আর্য্য সংসার যে অশ্বত্থের মত ব্যাপৃত ও বিশাল এবং ছায়া-স্নিগ্ধ। মোহমুগ্ধ কপোত-কপোতীর মত হোটেলের কামরায় স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ জীবনযাপন আমরা জানি না এবং ঐরূপ জীবন-প্রণালীকে আমরা ঘৃণা করি। আমরা বিশাল, আমরা বৃহৎ।

অশ্বত্থমূল—আর্য্য-সমাজ ও সভ্যতার প্রতীক। মানবতার পুনরুভ্যুদয়ের জন্য অশ্বত্থমূলেও জলদান করিতে হইবে, আবার অশ্বত্থরূপী ঐ আর্য্য-সমাজের মূলদেশেও শ্রদ্ধার জাহ্নবীবারি

অর্ঘ্যদান করিতে পারিলে শান্তির, সাম্যের, আতপ-তাপিত সংসার স্নিগ্ধ হইবে।

অশান্তি ও বৈষম্যের দাবদাহ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। বৈশাখ মাস, চল অশ্বত্থমূলে জল সেচন করি। আর্য্যভাবের ভাবুক হই, আর্য্য-সাধনার সাধক হই। জগৎ সংসার স্নিগ্ধচ্ছায়ায় সুশান্ত হইবে। অশ্বত্থমূল—আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা বেদী।

ধুচুনি, কূলা, ধামা

কূলা, ধুচুনি, ধামা! হাসিয়া উঠিলে যে! ডেষ্ট্রয়ার, ড্রেডনট, হাউইট্জার? না,—তাহার স্থানে ধুচুনি, কূলা, ধামা! কিন্তু সত্যই বলিতেছি—ধুচুনি, কূলা, ধামা! জাগরণকামী, আমরা আত্ম-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী, আমরা ঢেঁকি, ধামা, ধুচুনির দিনেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই।

সনাতনের প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠার জন্য ঐ প্রাচীন গ্রাম্য শিল্পের প্রতি অনুরক্ত নহি। বর্ত্তমান ফেরঙ্গ প্রগতির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছি না বলিয়া যে স্থবিরমনোবৃত্তি, তাহাও নহে! যে আত্মঘাতী মনোভাব আমাদের বর্ত্তমান অধোগতির কারণ, যে আত্ম-বিদ্বেষের ফলে ফিরিঙ্গী সূর্পণখা মিস্ মেয়োকে আমাদের গালাগালি দিবার অবকাশ দিয়াছি, যে ছিন্নমস্তা ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেকে ও নিজেদের পিতৃপিতামহগণকে জীর্ণ বলিয়া উপহাস করিয়া শিক্ষা, সভ্যতা এবং স্বদেশপ্রীতির জন্য গর্ব্ব প্রকাশ করি, সেই আত্মদ্রোহী, সর্ব্বনাশা মনোবৃত্তির কবল হইতে মুক্ত হইয়া, আত্মপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ হইবার জন্যই চাহিতেছি—ধুচুনি, কূলা, ধামা।

মুড়ি-ফুটকড়ায়ের দিন ফিরিয়া হয় ত আসিবে না। প্রতি-দ্বন্দ্বিতাবিহীন ঐ নিরীহ কুটীরশিল্প ঢেঁকি, কূলা, ধুচুনি হয় ত কাল-প্রবাহে চিরতরেই ভাসিয়া যাইবে! তুলসী তলে প্রদীপ না দিয়া

অন্তঃপুরিকা হয় ত ড্রয়িং রুমে সূইচ টিপিয়া তড়িৎবর্ত্তিকাই জ্বালাইবেন। দেব-দেউলে শঙ্খ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে হয় ত সন্ধ্যায় পিয়ানোর টুংটাংই শুনিতে পাইব! ভবিষ্য বাঙলার ঠাকুমা ও ও ঠানদিদিরা হয় ত নাতি-নাতিনীদের রূপকথা না বলিয়া জলসায় সাগরনৃত্যের ললিত লাস্য দেখাইয়াই কাটাইবেন। ভবিতব্য ভবিষ্যতে—বিধাতা তাঁহার কল্পনার সূতিকাগৃহে ভবিষ্য-ভারতকে কিরূপে সৃষ্টি করিতেছেন জানি না। কিন্তু আমাকে চাই, আমার আমিত্বের মহিমাকে চাই। চাই—আমার শ্লাঘার ব্যাপ্তি ও দীপ্তিবিকাশ!

জীব-জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, আমিত্ববোধ যেখানে যত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, প্রাণীত্ব সেইখানে ততই পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এককোষ (mono-cell) জীবে যতটুকু বোধ শক্তি, অবয়বযুক্ত প্রাণীতে তদপেক্ষা অধিক অনুভব-সামর্থ্য। এই আত্ম-অনুভবই উন্নয়নের প্রবর্ত্তক। এখানে জীব বিজ্ঞানের পর্য্যালোচনা করিব না, ইতিহাসের দিক দিয়া দেখাইব—যাহারা আত্ম-বিশ্বাসী, তাহারাই সর্ব্বপ্রকারে প্রগতিপ্রাপ্ত।

"তত্ত্বমসি"—এই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিব না; হয় ত কোন রাসভ কোথা হইতে চীৎকার করিয়া উঠিবে। প্রাচ্য ভারতের আলোক-রশ্মি যে মহীলতাকুলের সহ্য হয় না,—তাহাদের ভয় নাই। ফেরঙ্গ জগতের ইতিহাস দিয়াই দেখাইতেছি যে, মহাবলী নেপোলিয়ান শুধু আত্মবিশ্বাসবশেই একজন সামান্য সৈনিক হইতে য়ুরোপ বিজয়ী

সম্রাট শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংরেজের ক্ষাত্রবল অপেক্ষা তাহার জাতীয় গর্ব্ব সমধিক। মরণের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিজয়ী হইতে আত্মবিশ্বাসই সমধিক কার্য্যকরী।

আত্ম-বিশ্বাসের মূলে আত্মপ্রীতি। সম্প্রতি ফরিদপুরে একজন ইংরেজ—ইংলণ্ডে প্রস্তুত দেশলাই না পাইয়া অন্য দূরতর স্থান হইতে ঐ দেশালাই আনাইয়া তবে তাহার কার্য্য সাধন করিয়াছে। আর এই আত্মপ্রীতির বলে বলশালী বলিয়াই ছয় কোটী ইংরেজ বত্রিশ কোটীর শাসক। আর বত্রিশ কোটীর জাতি!—ফিরিঙ্গিনী মেয়ো বিবির 'বাঁ পায়ের' লাথি নিরুপদ্রবে সহিয়াছে এবং সেই লাথি সহিয়াও রাসভ বুদ্ধির প্রেরণায় চীৎকার করিতেছে,—আমরা অধম, আমাদের সনাতন সভ্যতা অধমতর! দাসত্বের শাস্তি কি সাধে সহিতেছি?

ঢেকি, কূলা ধুচুনি কিছুই নহে। একটা জাতি ও জাতীয়তার শক্তিও নহে, তাহাও বুঝি; তবু ঐ তুচ্ছ গ্রাম্যগৃহস্থালীর সামান্য ব্যবহার্য্য জিনিষগুলিকে ভালবাসি, নিবিড় মমতায় আবার গৃহ-কুট্টীমে সযত্নে সাজাইয়া রাখিতে চাই। নাই—বলিলে সাপের বিষ থাকে না। অবিশ্বাসে সর্ব্বনাশ করে। ভাল নয় বলিতে বলিতে, আত্মদ্রোহ করিতে করিতে—আমরা যে সর্ব্বহারা, নিঃস্ব, পথের কাঙ্গাল হইলাম! আমাদের কোহিনুর গিয়াছে, আসমুদ্র ক্ষিতি-পরিব্যাপ্ত রাজ্য গিয়াছে। আর গিয়াছে ঘরের লক্ষ্মী ও ক্ষেতের ধান। অবশিষ্ট ছিল জাতীয় মহিমার ঘোষণা—সভ্যতার বিজয়-কীর্ত্তি!

আজ তাহাও যায়। এখন অদৃষ্টে শুধু মেয়ে লাথি ! তাও সতী-সাধ্বীর লাথি নহে ! বারমুখী ফিরিঙ্গী বারবনিতার বাম পায়ের পদাঘাত !!

একটা সূত্র—মমতা উৎসারিত হইবার উৎসমুখ খুঁজিতেছি। ভাগীরথী শতমুখী হইয়া ভস্মীভূত সগর সন্তানকে খুঁজিতে যেমন প্রবাহিত হইয়াছিলেন, তেমনি সহস্র বাহু দিয়া স্বদেশের সর্ব্বস্বকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছি, অনুরাগ ও শ্রদ্ধাভক্তির সহস্র ধারা লইয়া দেশের বক্ষের মাঝে প্রবাহিত হইবার তপস্যা করিতেছি ! তাই ঘেঁটু মনসার কথা কই, ষষ্ঠী মাকালের গুণ গাই, মুড়ি-মুড়কিকে আদর করি, ধুচুনি, কূলা, ধামাকে বড় যত্নে ঘরে সাজাইয়া রাখিতে আগ্রহ প্রকাশ করি। দেখি, যে চিত্তখানি স্বভ্রষ্ট হইয়া স্বৈরাচারী হইয়াছে, তাহাকে আবার ঘরের মায়ায় চোখের জলে ফিরাইতে পারা যায় কি না।

কে বলিল—ধামা, কূলা, ধুচুনির কাঙ্গাল আমরা ? আমরা অমৃতের উপাসক। আমরাই বলিয়াছি ও বলিতেছি—যেনাহং আমৃতস্যাম্,: কিমহং তেন কুর্য্যাম্ !” কিন্তু ইহার আগে আমরা মমত্ববোধের সাধনা করিয়া শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে চাই, ভালবাসিবার শিক্ষা গ্রহণ করি।

ভালবাসা মোহ নহে। মোহ বস্তুদাস। য়ুরোপ তাই বস্তু-মোহাক্রান্ত হইয়া তাহারই পাষাণ পেষণে নিষ্পেষ্ট হইতেছে। নিত্য নূতন আবশ্যক ; কত খুঁটিনাটিই যে চাই, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই খুঁটিনাটির অভাব মিটাইতেই গিয়া প্রতীচ্য জাতির প্রাণান্ত !

আমরা বস্তুর দাস্য করি না। তাই কূলা, ধুচুনীতেই থামিয়া গিয়াছি; আর অগ্রসর হই নাই—অগ্রসর হইয়া হিংসা ও বিদ্বেষের ক্ষেত্রকে সুপ্রশস্ত করি নাই। বিশেষতঃ এই বিরল প্রয়োজনীয়ের একাকিত্বের মধ্যে থাকিয়া আমাদের একনিষ্ঠা বাড়িয়াছে; সংযত ও ধ্যান সমাহিত হইবার অবকাশ পাইয়াছি। শান্ত থাকিবার শক্তি লাভ করিয়াছি।

ধামা, কূলা, ধুচুনীর শিল্পে আবদ্ধ হইয়া এখানকার পুরুষ এনার্কিস্টও হয় নাই, নরহন্তা রাজনৈতিকও হয় নাই। এবং এখানকার নারী গৃহলক্ষ্মীই রহিয়া গিয়াছেন,—কামমুগ্ধা অলক্ষ্মী সাজেন নাই। সেইজন্যই ডেক্টয়ার ড্রেডনটের আধিপত্যের দিনেও বড় গলায় ঘেঁটুর গান গাহি,—ধামা কূলা ধুচুনির গুণ গাই! ফিরিঙ্গীর ভারবহ গাধা,—তার চীৎকারে কি আসে যায়।

ধামা, কূলা, ধুচুনি হয় ত পশ্চাৎপদ জাতির শিল্পজ্ঞানের পরিচয়। কিন্তু যখন বাঙ্গালার মেয়ের হাতে টেনিস্ ব্যাডমিণ্টন উঠে নাই, যখন তাহার কাঁকালে ধামা ও হাতে ধুচুনি কূলা ছিল, তখন বাঙ্গলার কুলকন্যা "উল্টা লাথি" দিতে জানিত।

অনেক বর্গীর পীঠে সেই লাথির স্পর্শ ঘটিয়াছিল, অনেক নীলকরের মুখে সেই উল্টা লাথির দাগ আছে!

আর যখন বাঙ্গালীর গৃহলক্ষ্মীরা ঢেঁকি, কূলা, ধুচুনি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, যখন প্রগতির টানে ভাসিয়া যান নাই; তখন তাঁহাদের সীথীর সিঁদুরের রক্তরাগের সহিত তাঁহাদের সতী মহিমার দীপ্তিও

জ্বল্ জ্বল্ করিত—ব্যভিচারিণী স্বৈরিণীর মত ফিরিঙ্গীর বিচার-বিপণিতে তাঁহাদের উন্নত মস্তক অবনমিত করিতে হয় নাই।

ঢেঁকি কূলার কথা কহি কি সাধে ? যখন ঐ সবে বাঙ্গলার মানুষ ও মন তৃপ্তকাম ছিল, যখন তাহারা মোটর-বিহারী হয় নাই, ফিরিঙ্গীর নকল-নবীশ বাবু সাজে নাই, কেরাণী ও উকীল হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধনের হেতু হয় নাই, তখন বাঙ্গলা অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান বারাণসীক্ষেত্র ছিল। আজিকার মত এমন হা অন্ন হা অন্ন করিয়া তাহাকে হাভাতে সাজিতে হয় নাই।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমহিমার উদ্বোধন চাই ! ব্যক্তি এবং জাতি জীবনের সর্ব্ব অনুভূতি দিয়া অনুভব করিতে চাই—আমরা মহীয়ান আমরা জগতের একটা বরেণ্য জাতি। ঢেঁকি, কূলা, ধামা একটা উপলক্ষ্য মাত্র—"ধুঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদা"। চাহিতেছি—শুধু আত্ম-উদ্বোধন—নিজস্বের প্রতিষ্ঠা ও অভ্যুদয়।

বিভ্রান্ত-বুদ্ধি অলক্ষ্মীর মত আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে ! আমাদের যত কিছু অনর্থের মূল আত্ম-অবিশ্বাস ও আত্মদ্রোহ। আমাদের মা-মাসীরা মন্দ কিছুকে গালি দিবার সময় বলিতেন—"কূলার বাতাস দিয়া দূর করিয়া দে।" এস, আমরাও আমাদের দুর্ব্বুদ্ধির, আত্মদ্রোহের দুষ্ট বুদ্ধিকে কূলার বাতাস দিয়া দূর করিয়া দিই।

জগন্নাথের রথ

আষাঢ়ের জলদজালে যে গুরু গুরু গর্জ্জন হইতেছে, উহা জগন্নাথের রথচক্রের ঘর্ষণজনিত আরাব। ঐ বিদ্দ্যুদীপ্তি তাঁহারই শ্রীঅঙ্গের জ্যোতির্লেখা। জগন্নাথের রথ চলিবে! ভগবান্ অবতীর্ণ হইতেছেন। জগতের নাথ ও নিয়ন্তা যিনি, জগতের দুর্দ্দিন আসিলে তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হয়। এবার জগতে দুর্দ্দিনের কাল বরষা। তাই জগন্নাথের অবতরণ সম্ভব হইয়া আসিল।

ভগবানের রথ চলে! দুর্ব্বার বেগে চলে। সেই রথচক্রের আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে জগৎসংসার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্থাবর ও জঙ্গম, জন্তু ও মানব—কেহই রক্ষা পায় না। ইহাই সংহারিণী শক্তি। বাঁচিব বলিলে বাঁচা যায় না, স্পর্দ্ধা করিলেও রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু বাঁচিবার একটি কৌশল আছে। সেই কৌশলকে অঙ্গীকার করিতেই এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান।

ভগবানের সহিত যোগ রক্ষা করিলে মরণভয় দূরীভূত হয়। ভগবান্ তাই বারম্বার যোগী হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। রথযাত্রায় যোগের একটা নির্দ্দেশ আছে। সেই নির্দ্দেশের স্মরণ, মনন ও অনুষ্ঠানের জন্যই রথযাত্রার পার্ব্বণ পর্ব্বাহ।

রথ আপনার বেগে আপনি চলে। কিন্তু রথরশ্মি আকর্ষণ করিতে হয়। রথের পাশেও দাঁড়াইতে নাই, দূরেও যাইতে নাই। অন্ততঃ ঐ রজ্জুকে ধরিয়া থাকিতে হয়। এই ধৃতি, এই সংযোগ, এই রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণের প্রয়াস, ইহারই নাম যোগ। যোগযুক্ত সংহারের চক্রনিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট ও ঘৃষ্ট হয় না।

রথের চতুষ্পার্শে উৎসব। কত খাদ্য—পেয়, কত হাস্য গান, কত রঙ্গ তামাসা, কত ভেঁপুর শব্দ! ইহাতে চিত্ত সহজেই প্রলুব্ধ হয়। রথ টানিতে সাধ যায় না। এই আনন্দ সমারোহেই মাতিয়া থাকিতে প্রলোভন জাগে। শুধু জাগে তাই নহে, সাধারণ মানুষ এই মোহেই মুগ্ধ হইয়া ভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া যায়। সভ্যতার বিলাস সমারোহে প্রলুব্ধ হইয়া কত জাতি অভাগবত হইয়া রথ-চক্রের নিষ্পেষণে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

আর্য্য ভারত রথযাত্রার অনুষ্ঠান করে, এবং ভগবানের সহিত একটা গূঢ় সংযোগ রক্ষা করিয়া চলে। আপদে-বিপদে, উৎসবে সমারোহে কখনও ভগবানের রথরজ্জু পরিত্যাগ করে না! আর্য্য জাতি তাই জগন্নাথের রথচক্রের নিষ্পেষণে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই, যাইবেও না। ভগবান্ এই জন্যই পার্থকে আদেশ করিয়াছেন:—'তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন।' ইহারই নাম অমৃতত্ব লাভ।

জগন্নাথ অবতরণ করেন। আবার তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনিতে হয়। গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং—আপ্তকাম পুরুষকে লোক লোচনের সমক্ষে, সংসার সমাজের আবর্ত্তের মধ্যে, সীমার

ধূলি-ধূসরিত পথপ্রান্তে টানিয়া আনিতে হয়। ইহাই মনুষ্যত্বের সার্থকতা। মানবতার শ্লাঘনীয় অবদান—"করিব কৃষ্ণে সর্ব্ব নয়ন-গোচর"—এতখানি মহিম্ন তেজ দম্ভ না থাকিলে ক্ষুদ্র মানুষ নিতান্তই ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। "তেল নুণ লকড়ির" জন্য যে সংগ্রাম, তাহা অধঃপাতের পরিসেবন।

মানবতার পৌরুষ আকর্ষণে জগন্নাথকে টানিয়া আনিতে হয়, আনিবার প্রয়োজন হয়। সংসারে মানবতার অবশেষ থাকিলে এই স্পর্দ্ধার মহিম্ন-স্তোত্র উদ্গীত হয়—"করিব কৃষ্ণে সর্ব্বনয়ন-গোচর।" কৃষ্ণকে দেখা ও দেখান একটা বিলাস নয়, অহঙ্কারের উদ্বেলিত অভিমানও নহে; ইহা শক্তির সহিত প্রীতি; ভক্তির সহিত ক্ষমতা। ঈশ্বরকে অবতরণ করা নয় পৌরুষের একটা স্বার্থকতা আছে; আবার মানব-প্রীতির একটা অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষাও উৎসারিত হইয়া উঠে।

জগৎ কখন কখন আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মনুষ্য স্বভাবে পাশবতার আবেশ হয়। তখন শক্তি মদমত্ত হয়, সভ্যতার অনুষ্ঠান অভিচার-ব্রতে পরিণত হয়, নীতি-নিয়ম উৎপীড়ন-উপদ্রবে পর্য্যবসিত হয়। এমন দিনে মানুষ কেহ থাকিলে স্নেহবিগলিত অন্তরে প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করে—"করিব কৃষ্ণে সর্ব্বনয়ন-গোচর।" ইহাও রথযাত্রা। আত্মরক্ষা ও আর্ত্তরক্ষা উভয়ের জন্যই জগন্নাথ দেবের রথ টানিবার প্রয়োজন আছে। আজ আত্ম ও আর্ত্ত উভয়েরই রক্ষা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। আজ শ্রীহরির

রথ-রশ্মিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে, আবার তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া মর্ত্ত্যের মাঝে অবতীর্ণ করাইতে হইবে।

এত যে অনাচার, ব্যভিচার! এত যে উৎপীড়ন-নিপীড়ন! এত যে অনৃতের দাসত্ব! রসবন সুন্দরকে নয়ন-গোচর করি নাই বলিয়াই ত! ধূলি লইয়া যে মজিয়া আছি; অমৃতের উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া আজ অমর্ত্ত্যের রত্নবেদী হইতে নামাইয়া রস-স্বরূপকে মর্ত্ত্যের মাঝখানে অবতরণ করাইতে হইবে। ইহাই ত রথ-যাত্রা। আর্য্য জাতির ইহাই ত জীবন-ব্রত।

রথ ভারতের ব্রত! ভারতের উৎসব! আর্য্যের পার্ব্বণ! অসত্যের আবর্জ্জনা অপসারণ করিরা সত্যস্বরূপ জগন্নাথকে আমরা মৃত্যুপন্থী, উন্মার্গগামী মানবের মাঝে টানিয়া আনি। ইহাই ত ভারতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। আবর্জ্জনা-জঞ্জাল পুঞ্জীভূত, এই বারই ত রথ টানিবার প্রয়োজন। আর্য্যজাতি হইয়া জগতে যদি শ্রীভগবান্‌কে নামাইতে না পারিলাম, তবে বৃথাই হইলাম আর্য্য-বংশধর। তাহারা আনে মৃত্যুর উপহার, বিভ্রান্তির বিলাস উপকরণ। আমরা আনি—অমৃতের সঞ্জীবনী প্রবাহ, প্রজ্ঞার উদ্ভাসিত আলোক!

রথযাত্রার যেমন একটা পারমার্থিক দিক্ আছে, তেমনি আছে একটা লৌকিক অভিব্যঞ্জনা। "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—ভারতের জনসাধারণ রথে বামনরূপী ভগবানকে দেখিয়া মর-জন্মের অসত্যকে পরিহার করিতে চায়। ইহাই ভারতের

গণ-শিক্ষা। (Mass Education) ইহাই আবার উচ্চ শিক্ষা। ভগবানের টানে, পুণ্যের আকর্ষণে উদ্বোধিত করা, ইহা অপেক্ষা সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা আর কি আছে? রথে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে আসমুদ্র ভারতের সারাটা জাতি আকুল হইয়া উঠে। এতগুলি মানুষকে ভাগবত ভাবে অনুপ্রাণিত করার যে ব্রত-পদ্ধতি, তাহা মহৎ হইতে মহত্তর।

পুনর্জ্জন্ম চাহি না। সেই জন্যই রথে আজ জগন্নাথকে অধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিব—অন্তরের দিকে। আবার সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র বামনরূপী শ্রীহরিকে সন্দর্শন করিয়া পুনর্জ্জন্মের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে বাসনা করি।

এই পুনর্জ্জন্ম ঠিক জন্মান্তর নহে। পুনর্জ্জন্ম অর্থে ভারত ছাড়িয়া অন্য কোন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ। ভারতের মাটী ছাড়া অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করিতে চাহি না, করিব না। এই মৃত্তিকাই জন্মজন্মান্তরের স্বর্গ ও সাধনা। এই মাটীতে জন্মিলে জগন্নাথের রথরশ্মি আকর্ষণ করিবার সৌভাগ্য ঘটে। গোঠে মাঠে সেই পরম সুন্দরকে লইয়া গোচারণ করিতে পাই। আদর করিয়া তাঁহার কাঁধে চড়ি, এঁটো ফল খাওয়াই! আবার দিন আসিলে তিনিই সারথ্য করিয়া কুরুক্ষেত্র রণজয় করিয়া দেন। ভারতের মাটী ছাড়া সেই জন্যই ত অন্য কোথাও জন্মাইতে নাই, সে সাধও পোষণ করিতে নাই। ভারতের মাটি মোক্ষ—মুক্তি অপেক্ষাও মহত্তর—স্বর্গ অপবর্গ অপেক্ষা শুভঙ্কর।

ভগবান্‌কে এই ধূলিমলিন মর্ত্ত্যভূমিতে টানিয়া আনা বর্ত্তমান ভারতের একটা পরম কর্ত্তব্য। আজিকার জগতে মানুষ নাই, প্রেতের তাণ্ডব আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান্ নাই, ভগবানে অনুরাগ নাই! এমন দুর্দ্দিনেই ত ভগবান্‌কে টানিয়া আনিতে হয়। আর ইহাই ত ভারতের সাধ্য ও সাধনা, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ।

দুর্দ্দিনের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। কড়্ কড়্ বজ্র হানিতেছে। আকাশে আলো নাই, মর্ত্ত্যে মানুষ নাই। স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গৃহকোণে ভোগ-বিষাক্ত চিত্ত মন লইয়া মানবপশু লুক্কাইত। ভারতের মানুষ আমরা, ভারতের সন্তান আমরা—ভগবান্‌কে নামাইয়া আনিয়া এই কালদিনের অবসান ঘটাই চল। দিগন্ত কাঁপাইয়া ডাকি এস, টান, টান। ভগবান আসিবেন, আসিতেছেন, আনিব আমরা তাঁহাকে!—"করিব কৃষ্ণে সর্ব্ব নয়নগোচর।" এই ত রথযাত্রা।

রথতলায় আজ বড় ধূম! তাল পাতার পাখী, মাটীর পুতুল, বাঁশের বাঁশী। কত কাঁঠাল, কত মোয়া মিঠাই—আনন্দের জল-প্লাবন! সমারোহের যেন শুভ বাসর! আজ যে রথ! আজ যে জগন্নাথকে টানিয়া আনিব! আজ যে বড় শুভদিন!

কিন্তু সাবধান। রথ রজ্জু ছাড়িও না। যোগভ্রষ্ট হইয়া রথচক্রে ঘৃষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইবে। ঐ প্রসারিত রশ্মি সনাতনের সংযোগ। ঐ রশ্মি ছাড়িয়া দিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। দুর্নিবার দুর্দ্ধর্ষ কাল কবলিত করিয়া ফেলিবে। রজ্জু ধরিয়া থাক, আর রথোপরি

বামনরূপী শ্রীহরিকে দর্শন করিতে করিতে রথ টান এবং প্রার্থনা নিবেদন কর—ভারতের মৃত্তিকা ছাড়া আর কোথায় যেন জন্ম লইতে না হয়।

টান, টান, ওরে ভারতের সন্তান! পিশাচ-অধ্যুষিত জগতে ভগবানকে টানিয়া আন্—রথযাত্রা যেন সার্থক হয়!!

শিবের সলিতা

'শিবের সলিতা' জ্বালাইয়া রাখিতে হয়, নিভিতে দিতে নাই। সকলে পারে না, ঘুমাইয়া পড়ে ; এক জনকেও জাগিয়া সারা রাত্রি অপলকনেত্রে চাহিয়া শিবের সলিতায় তৈল যোগাইতে হয়। 'শিবের সলিতা' যাহার বা যাহাদের জ্বলিয়া থাকে, তাহাদের কখনও অমঙ্গল হয় না—হইতে পারে না।

বিজলী বাতি জ্বলে—দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলে! কিন্তু ইহা ত 'শিবের সলিতা' নহে! ইহার দীপ্তিচ্ছটা হইতে ত মঙ্গলের রশ্মিরাগ বিচ্ছুরিত হয় না! কাহারও মমতাপূত হৃদয়খানি ইহাকে প্রদীপ্ত রাখিতে স্নেহ-ব্যাকুল অন্তরে নিশি জাগরণ করে না ; বরং যাহাদের চেষ্টা ও শ্রম ঐ বিজলী-প্রভাকে আলোকিত রাখিতে সচেষ্ট হয়, তাহাদের শ্রম-কাতর চিত্ত হইতে অভিসম্পাতের স্ফুলিঙ্গজ্বালা ঠিক্‌রাইয়া পড়ে। তাই বলিতেছি ভুল করিও না ; বিজলীদীপ্তি 'শিবের সলিতা' নহে। বিজলী নিভিয়া যায়, যাক্—'শিবের সলিতা' নিভিতে দিতে নাই। চৈতালীর এমনই রৌদ্র প্রখর দিনে যখন জননী বসুধার বক্ষ পর্য্যন্ত দাবদাহে শুকাইয়া উঠে, তখন মা আমার সারাদিন উপবাসে রহিয়া শিবের ঘরে বাতি দিতেন এবং সারারাত্রি জাগিয়া সেই ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতেন! পরদিন প্রাতেঃ স্নানান্তে শিবপূজা করিয়া কি বর মাগিতেন জানি না,—আমাদের আশীর্ব্বাদ

করিয়া তবে জলগণ্ডুষ গ্রহণ করিতেন। ফেরঙ্গ-শিক্ষা-দুষ্ট মনে তখন মায়ের এই ব্রতানুষ্ঠানকে পল্লী নারীর কুসংস্কার ভাবিতাম। এখন বুঝিতেছি, শিবের ঘরে বাতি দিতে হয়, এবং 'শিবের সলিতা' নিভিতে দিতে নাই।

'শিবের সলিতা' একটা সনাতন ধারা। যুগযুগান্ত ধরিয়া বংশানুক্রমিক পারম্পর্য্যে যে সাধনা—যে রীতিনীতি—যে স্বভাব সংস্কার—ব্যক্তিমানব এবং সমষ্টিমানবের মাঝে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই 'শিবের সলিতা'। শিব কল্যাণময়—মঙ্গলের দেবতা, ঐ সনাতনী ধারায় মঙ্গলের প্রবাহ ওতপ্রোত, তাই উহাকে 'শিবের সলিতা' বলা হয়। এই ধারা হইতে বিচ্যুত হইলে জীবন বিকাশের অন্তরায় ঘটে; উহাই ত অমঙ্গল! সেই জন্যই অনুশাসন 'শিবের সলিতা' নিভিতে দিতে নাই।

পুরাতনের প্রতি একটা অহৈতুকী মায়া জন্মায়! সনাতন এবং তাহার ধারা শুধু পুরাতন নহে;—উহা সত্যের ও কল্যাণের দীপশিখা। উহা মৃত্যুর অন্ধকার হইতে প্রাণের সঞ্জীবনী আলোকে প্রভান্বিত করে। সনাতন এবং ধারা দুইটা বিভিন্ন বস্তু। সনাতন হইতেছে—আবহমান কালের সৃষ্টি ও স্থিতিমূলক সত্য, মঙ্গলের আস্পদ, অভ্যুদয়ের উদ্বোধক এবং ধারা হইতেছে তাহারই প্রবাহ পারম্পর্য্য। দুইটাই অবলম্বনীয়, দুইটিই স্বীকার্য্য। কোনটার অঙ্গীকারে ব্যতিক্রম ঘটিতে দিতে নাই। শিবের সলিতা নিভিতে দিতে নাই।

'প্রোটোপ্ল্যাজমের' অভিব্যক্তিই জীবনের বিকাশ ঘটায়, ইহার তুল্য বৈনাশিক মতবাদ আর নাই,—থাকিতে পারে না। আমি—আমার মনুষ্যত্ব—আমার প্রতিভা, বুদ্ধি একটা আকস্মিক ব্যাপার এবং উহা একটা সম্মূঢ় স্পন্দনের অভিব্যঞ্জনা, ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত মতবাদ আর কি হইতে পারে!

বৈজ্ঞানিক প্রাণ-বস্তু protoplasm একটা রাসায়নিক বস্তুর অপেক্ষা বড় কিছু বেশী নহে, তাহাতে প্রজ্ঞা চৈতন্য—আত্মার কোন বিভূতিই বর্ত্তমান নাই! তাহাতে না আছে পৈতৃকত্ব, না আছে জন্মান্তরীণ ধারা। ইহা প্রায় জড়তুল্য। প্রোটোপ্লাজমের বিজ্ঞান, সনাতন নহে, সনাতনের স্বরূপ অন্যবিধ।

শিবের ঘরে বাতি দিয়া আমরা ধ্যান করি—আমরা শিবস্বরূপ। আমাদের অতীতে, বর্ত্তমানে একটা মহিম্ন-সত্ত্বা ছিল, আছে এবং থাকিবে। এই সত্ত্বা—বিশ্বসৃষ্টির সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত। ইহা স্রষ্টার লীলা সহচর। বৈষ্ণব সাধকের সেই কথা স্মরণ থাকে যেন, "অন্যের হৃদয় মন, আমার মন শ্রীবৃন্দাবন"। ব্যভিচারের কালিমা-তিলক, হাসপাতালে বর্দ্ধিত, পৈতৃকত্ব বিহীন কুড়ানো সন্তান foundling—যাহার জন্মে শিবও নাই—শিবের ঘরে বাতি দিবার জননীও নাই, সনাতনী—তাহাদের বুদ্ধির অগম্য। 'শিবের সলিতা' জ্বালাইয়া রাখিবার সার্থকতাও তাহাদের নাই। কামাতুরতা তাহাদের জন্মের হেতু; কাজেই তাহাদের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শিরের সলিতা জ্বালাইয়া না রাখাই ভাল।

মানবতার অভ্যুদয় ব্যাপারে গোত্রগণের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিতে এবং চরিত্র-বিকাশের সহায়তার জন্য শিবের সলিতা জ্বালাইয়া রাখিবার যেমন একটা তাত্ত্বিক সার্থকতা আছে, তেমনি ব্যবহারিক দিক দিয়াও ইহার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। শিবধ্যান এবং শিব-কর্ম্ম অহরহই প্রয়োজন। মানবের হৃদয়বেদীতে মহাদেব জাগ্রত না রহিলে প্রমথ পিশাচের নৃত্যে হৃদয় শ্মশান হইয়া পড়ে।

শিবের সলিতা নিভিয়া গিয়াছে। কেহ আর শিবের ঘরে প্রদীপ দেয় না। তাই অমানুষিকতার নিবিড় অন্ধকার বিশ্ব-নিখিলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; আর সেখানে ভূত-প্রেত নৃত্য করিতেছে। ভূতের তাণ্ডব দেখিতে পাও নাই ?

আমি খাইতে পাই না, তুমি প্রচুর ভোজনে পরিতৃপ্ত! বিশ্বের জননী নারী বলিলেন,—আমি রতিবিলাসে প্রমত্তা রহিব, সন্তান গর্ভে ধরিব না!! বিপ্লব উদ্দীপিত নাগরিক চীৎকার করিতেছে—ঈশ্বর নাই! দেব-দেউল চূর্ণ কর!! প্রজা রাজার মস্তক চূর্ণ করিতেছে! রাজা প্রজাপুঞ্জকে শোষণ করিয়া কঙ্কালসার করিতেছে! সংযম ও সত্য হইতেছে দুর্ব্বলতা! স্বেচ্ছাচার হইতেছে সভ্যতা! প্রীতি এবং মৈত্রীর স্থানে বিজীগিষা হইতেছে মানবতার ভিত্তি। ধর্ম্ম হইয়াছে আবর্জ্জনা! জগৎ-সংসার ভূত-প্রেতের লীলাভূমি হয় নাই ত কি ? আর কি হইলে মানুষ পিশাচ হয় ?

প্রেত ও পিশাচ আছে; কিন্তু তাহার মাঝে শিবকে প্রতিষ্ঠা

করিয়া পূজা করিলে, প্রমথবৃত্তি সংযমিত হয়, প্রেত প্রকৃতির আধিপত্য কমিয়া যায়। শিব সাধনা করাই শিবের ঘরে বাতি দেওয়া এবং তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত থাকাই—শিবের সলিতা নিভিতে না দেওয়া।

শিবব্রত হইতেছে—"ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা"—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। এই ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার শাস্ত্রবিহিত উপায় আছে। তাহার নাম বৈধ ভোগ বা বৈধ কর্ম্ম; শুধু ভোগ বা উপভোগ enjoyment প্রেতত্বের দীক্ষা দেয়; কিন্তু শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ভোগে ও কর্ম্মে ভোগপরায়ণতায় প্রেত-প্রকৃতি বিনষ্ট হয়। ব্রত, নিয়ম, পার্ব্বণ, দানধ্যান, যাগযজ্ঞ এই সব বৈধ কর্ম্ম, বৈধ-ভোগ।

শক্তির সাফল্যে অহঙ্কার প্রমত্ত হইয়া উঠে। তখন মানুষের শুভবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। ভাল-মন্দের তারতম্য জ্ঞান থাকে না, সর্ব্বগ্রাসী আমিত্ব তখন পিশাচবৎ হইয়া উঠে, একটা দৃষ্টান্ত দিব। তুমি লক্ষ-পতি, বিলাসের তাড়নায় মোটরবিহারী হইয়া নগরের বক্ষভেদ করিয়া ছুটিতেছ, দিগ্বিদিক্ তোমার জ্ঞান নাই। আমি দরিদ্র, হয় ত সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্তশরীরে গৃহ-প্রত্যাগত হইতেছি, আমার পঞ্জরগুলি চূর্ণ করিয়া তোমার মোটর বিদ্যুদ্বেগে চলিয়া গেল! ইহা বর্ত্তমানের নিত্যকার ঘটনা এবং এই ব্যাপার বাড়িয়াই চলিতেছে।

শিবের সলিতা জ্বলে না, কল্যাণের আদর্শ মানব অন্তরে ঠাঁই পায় না, তাই এই দুর্দ্দান্ত পৈশাচিক উপদ্রবের নিত্য-সংঘটন। দুর্ভিক্ষে

লোক মরে—সহা যায়। উহা দৈব দুর্ব্বিপাক! কিন্তু একটা জনাকীর্ণ সহর বা গ্রামে উপবাস-ক্লিস্ট মানুষ ক্ষুধার অসহ্য তাড়নায় আত্মহত্যা করে, সহস্র গগনচুম্বী হর্ম্ম্যমালা থাকিতে লক্ষ লক্ষ অনাথ আতুর গ্রীষ্মের দাবদাহে, শীতের হিমসম্পাতে, ঈর্ষার বারিধারায় পথের ধুলায় পড়িয়া থাকে, কেহ দেখে না,—ভাবে না,—কোন প্রতিকারের চেষ্টা করে না। প্রেতত্বের আর বাকী কি?

ভাবিবার সময় নাই, করিবার মন নাই। শিবের সলিতা নিভিয়া গিয়াছে। হৃদয়শ্মশানে প্রেত পিশাচের নৃত্য—কাড়াকাড়ি খাওয়াখায়ি, মারামারি! বিশ্বের মাঝে মহাদেবতা নাই।

প্রেতত্বের অপনোদনের জন্য শিবত্বের আরাধনা প্রয়োজন! এই দুর্ণিবার সংঘর্ষ, এই মুখর কর্ম্মপ্রবাহ, ইহার আবেষ্টন ও আকর্ষণ হইতে দূরে আসিয়া শুদ্ধচিত্তে ধ্যান করিতে হইবে।—তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।—অনুধ্যান করিতে হইবে—"সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং!" প্রার্থনা করিতে হইবে—"স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু!!

সংসারে যদি কিছুর দারুণ অভাব হইয়া থাকে, তাহা এই শিবভাবের। ইহার জন্যই বিপ্লব বা বেকার-সমস্যা। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষের কারণও ইহাই। যত কিছু উৎপাত উপদ্রবের মূল এই শিবভাবের অভাব। অপরের জন্য ভাবনা, মনুষ্যের জন্য দরদ, সেবার ব্রত, যতক্ষণ না এই সব মঙ্গলময় ভাবনা মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ উপজীব্য হয়, ততক্ষণ সংসারে অশান্তির শ্মশান শিখা রাবণের চিতার মতই জ্বলিয়া

রহিবে। প্রেমের পরিচয় সেবায়, আত্মবিসর্জ্জনে! শিবভাবের অভাবে জগতে আজ প্রেমের পর্য্যন্ত অন্তিমদশা উপস্থিত। ডাইভোর্স নাকি বাড়িয়া চলিতেছে। নর নারীর প্রেম দুই দিনের পর তিন দিনে ফিকা হইয়া যায়। তাহার পর বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা সংসারে অনেক সমস্যার মধ্যে এই প্রেমের সমস্যাও একটা প্রবলতম সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

ডাইভোর্স ব্যাপারকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না! প্রেম আত্মত্যাগমূলক। প্রেম যদি মনুষ্যহৃদয় হইতে উন্মূলিত হয়, তাহা হইলে শুধু গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠানে অশান্তি বাড়িবে, তাহা নহে; মনুষ্য সত্যই পশু হইবে।

সমস্ত অশান্তির সমাধান হইবে—শিবের সলিতা আবার জ্বালাইয়া দিলে, মঙ্গল ভাবের ভাবনায় ভাবিত হইলে। এই শিবের সলিতা ভারতীয় সভ্যতা। সারাজগৎ ব্যাপিয়া উৎকট ও বিকট অন্ধকার। এস, আজ মমতাপূত হৃদয়ে শিবের সলিতা জ্বালাইয়া প্রার্থনা করি ঃ—"তেজো যৎতে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।"

———

স্বরাজ আঙিনায়

পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে—কাল-বৈশাখীর প্রলয় নর্ত্তন; আবার ভারতের মস্তকে প্রতীচ্য উপকূল হইতে দণ্ডের ঝঞ্ঝাবাত্যা বহিয়া আসিতেছে। সমস্যা শুধু ঘনীভূত নহে, সঙ্কটের দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে যাত্রা করিতে হইয়াছে। পথ কণ্টকাকীর্ণ, চতুর্দ্দিক অন্ধকারাবৃত, অবলম্বন হস্তচ্যুত, মাথার উপর বজ্রের গর্জ্জন। কিন্তু অন্তরের মাঝে উদ্দীপিত প্রেরণা—স্বরাজ্য-সিদ্ধি চাই—অবশ্যই চাই।

দুর্য্যোগ যখন উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন চিত্ত-বৈকল্য ঘটে; যাহার নাম অব্যবস্থিতচিত্ততা। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেই প্রয়োজন স্থিরসংকল্প, পথের সুনির্দ্দিষ্ট দিক, কর্ম্মের সুব্যবস্থিতগতি এবং লক্ষ্যের ধারণা।

স্বরাজ আমাদের একান্তই প্রয়োজন, আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ইহার জন্য ভারতীয় জাতির প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে এবং সেই আকাঙ্ক্ষা নানারূপে—নানা স্তরে প্রবাহিত হইয়া আজ বর্ত্তমান স্বাধীনতা-আন্দোলনে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

জাতির রাষ্ট্রচেতনা কিন্তু স্বাধীনতালাভের সুনির্দ্দিষ্ট পন্থাকে এখনো সমগ্র চিত্ত দিয়া গ্রহণ করে নাই। অশস্ত্র বিপ্লব, অহিংস-অসহযোগ, আইন-অমান্য সবই এখন উত্তেজনার বাষ্পমূর্ত্তিতে

আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! ইহার উপর আছে—শাসনের দুর্ব্বার প্রতিবন্ধকতা। বাধা, নিষেধ, হুঙ্কার, ভর্ৎসনা, অর্থদণ্ড, কারাবাস, নির্ব্বাসন—এই সব ভ্রূকুটি করিয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। সময়ে সময়ে নৈরাশ্য আসে যে, রাজলক্ষ্মী সমুদ্রের অতল তলে ডুবিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করা বুঝি আমাদের সাধ্যের বাহিরে।

যুদ্ধ করিব না, রক্তপাত করিয়া, হিংসা-ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র-সিংহের মত যুদ্ধ করিব না। কিন্তু ভারতীয় জাতির আজ স্বরাজ ও স্বাধীনতা চাই—সর্ব্বস্বের বিনিময়ে চাই। নিরাশা—নিশার স্বপ্ন, ভীতি—একটা ভ্রান্তি। ভারত স্বরাজ্য লাভ করিবেই।

ঘরের আঙিনায় ফিরিয়া আসাই আমাদের স্বরাজ লাভের অব্যর্থ উপায়। জানি এবং বুঝি, বাহিরে গিয়া—বাহিরের প্রলোভনে প্রমত্ত হইয়া, আমাদের জাতীয় জীবনের সম্পদ-শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই বহির্ম্মুখী, উন্মার্গগামী বুদ্ধি গৃহের দিকে ফিরাইয়া আনিলে স্বাধীনতা সুসাধ্য হইবে।

রক্তপাত করিব না, কিন্তু বাহিরের মাটিতেও পাদক্ষেপ করিব না। গৃহে যাহা আছে, তাহা লইয়াই পরম তৃপ্তিতে জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করিয়া চলিব। গৃহে যদি খুদ-কুঁড়া থাকে, তাহাই হইবে আমাদের কৌস্তুভ-কোহিনূর! ঘরের চীরবাস হইবে—মহামূল্য সজ্জা! গৃহ স্বর্গের অপেক্ষাও বরণীয় হইবে। লক্ষণের গণ্ডীর মত একটা গণ্ডী টানিয়া তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিব।

য়ুরোপের জয় আমাদের পরাজয়ে। ফিরিঙ্গী বেনিয়া যে

দিন কাচের বিনিময়ে আমাদের কাঞ্চন লইয়াছে! দুর্ব্বুদ্ধিবশে যে দিন আমরা ঐ কাচখণ্ডকেই কৌস্তুভ বলিয়া আদর করিয়া ঘরের লক্ষ্মীকে সাগর পারে পাঠাইয়াছি, সেই দিনই আমরা পরাজিত হইয়াছি। রাজ্য—পথের ধূলি, হারায়—আবার কুড়াইয়া পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্মীকে অনাদরে উপেক্ষায় দূর করিয়া দিলে, দুর্গতির অবশেষ থাকে না, আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। নহিলে যে দেশে এক বৎসর ফসল ফলিলে তিন বৎসর চলিয়া যায়, সেই দেশে অর্দ্ধেক লোক এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। দেশলক্ষ্মীর অভিসম্পাত!

খাইতে পায় না!—খাইতে পাই না!! খাইতে পাইলে আজ ভাবনা ছিল কি? আজ বেহারের চৌবে, দৌবে, মিশির যদি খাইতে পাইত, তবে বাঙ্গলার বাঁশ বাঙ্গালী ছেলের মাথার রক্তে জননী বসুধার বক্ষ প্লাবিত করিত না! মুখুয্যে, বাঁড়ুয্যে, চাটুয্যে, ঘোষ, বোস, মিত্তির, সেন, রায়কে আজ গোখাদক বিদেশী প্রভুর বুটের লাথি খাইতে হইত না! স্বেচ্ছায় নির্ব্বুদ্ধির বশে যে দেশলক্ষ্মীকে অশোক-কাননে নির্ব্বাসিত করিয়াছি, এই বুভুক্ষার-দাহ, এই নির্য্যাতনের যন্ত্রণা,—বুঝি তাঁহারই বেদনার প্রতিবেদনা!

খাইতে পাইতাম! যা' তা নহে,—পেট ভরিয়া ক্ষীর সর ছানা খাইতাম। দুধি-ভাতিতে বাঙ্গালী চির পরিপুষ্ট ছিল। হায়, দুগ্ধদাত্রী বাঙ্গালীর গোঠ-গোয়াল-শোভনা সুরভীনন্দিনী!

তুমি আজ বাঙ্গালী ছেলের মুখে দুধ দাও না। খাদ্য হইয়াছে—ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গীর! আর আমাদেরই দুর্ব্বুদ্ধিতে।

ঘরের আঙিনায় ফিরিয়া আসিব! ইহাই বলিতেছিলাম। বিদেশের কোন কিছু স্পর্শ করিব না। গত দুই শত বৎসর সভ্য সাজিয়াছি। আর আগামী দুই শত বৎসর না হয় অসভ্যই সাজিব! বিদেশের কোন কিছু ছুঁইব না। জামার পরিবর্ত্তে উত্তরীয়ে দেহাবৃত করিব, জুতার বদলে কাষ্ঠপাদুকায়। রোগে যখন তুলসী পাতার রস, বেলপাতার রস খাইতাম, জটি বড়ীর পুঁটুলি খুলিয়া যখন ঠাকুমা ঔষধ দিতেন, যখন বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার লাল নীল ঔষধ খাই নাই, তখন এক শত বৎসর পরমায়ু ছিল। বিলাতী জমাট দুগ্ধ প্রভৃতি না খাইয়া যখন গুড়-মুড়ি খাইতাম, তখন বাঙ্গালীর বিঘূর্ণিত লাঠি হইতে বজ্র ঠিক্‌রাইয়া পড়িত। তাই বলিতেছি,—স্বরাজ লাভ করিব ঘরের আঙিনায়!

স্বরাজ গৃহের আঙিনায়! বিলাতী বস্ত্র শুধু বর্জ্জন করিলে চলিবে না। স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বোচ্চ মূল্য দিতে হইবে। গরুর গাড়ীতে চড়িতে হয়—তাহাই চড়িব! বাইক-মোটর চড়িব না! লাথি-ঝাঁটা আর খাইতে পারি না।—ওগো বাঙ্গালীর জননী ভগিনি! আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দাও—তোমার সেলাইয়ের কল! ঘর দ্বার ঝাঁটাইয়া আবর্জ্জনা ফেলিবার সাথে গৃহের মাঝে বিলাতী ও বিলাতীয়ানার যে অস্পৃশ্য আবর্জ্জনারাশি স্তূপীকৃত আছে, তাহাতেও ঝাঁটা লাগাও!

স্বরাজ চাই!—আর এক মুঠা ভাতের জন্য বাঙ্গালী যুবকের আত্মহত্যা সহিতে পারি না! সহিতে পারি না,—কচি কচি সোনার পুতুলদের মাথায় যখন-তখন বে-পরোয়া লাঠী! ক্রন্দন, ক্রোধ, ক্ষোভ, দুঃখ, প্রতিবাদ, আন্দোলন এ সব নহে;—প্রতিকার রহিয়াছে ঘরের আঙিনায় ফিরিয়া আসায়! স্বপ্রতিষ্ঠায়—আত্মমহিমায় গৌরবান্বিত হওয়ায়। আপনার প্রেমে প্রমত্ত হওয়ায়!

বিলাতী বর্জ্জন—বিলাতী মন বর্জ্জন—বিলাতী ভাব বর্জ্জন—আমাদের মুক্তির সিদ্ধ তপস্যা! হে ইংরাজী শিক্ষিত মিষ্টার ও বাবু! গ্রামের কোলে দাদাঠাকুর, খুড়ো মশাই হইয়া ফিরিয়া এস। মোকর্দ্দমার আপোস-সালিশি কর! বেথুন লরেটোর পাষাণ-বেষ্টনী হইতে বাহির হইয়া গঙ্গাস্নানে চিত্ত পরিশুদ্ধ করিয়া ওগো বাঙ্গলার কন্যাকুল! চল গ্রামে যাই। গিয়া উঠানে ধানের মরাই ও গোলার কাছে আলিপনা দিবে! বাপ-পিতামহের ভিটায় সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবে! উচ্ছ্বাস নহে,—গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনে আমাদের স্বরাজলাভ হইবে। বিলাতী বর্জ্জনের সিদ্ধি—গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনে! স্বরাজ—ঘরের আঙিনায়!!

তুলসীতলে—প্রদীপ

বড় অন্ধকার করিল—সন্ধ্যা!—তুলসীমূলে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়া দাও! অন্ধকার গাঢ়তর! যেন সর্ব্বনাশের সূচনা ঘনায়িত হইয়া উঠিয়াছে! দারিদ্র্যের অন্ধকার, দুর্ব্বলতার অন্ধকার, অবমাননা অনাচারের অন্ধকার! দীপ্তি নাই,—তৃপ্তি নাই। নাই—মানবতার দীপ্তি, নাই—আনন্দের তৃপ্তি! শুধু তামসী নিশীথিনী। তাই বলিতেছি, এস শ্রদ্ধায় নত হইয়া, তুলসীমূলে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়া দিই!

সূর্য্য অস্তগত হইলে যে অন্ধকার ধরিত্রীর বুকে নামিয়া আসে, এ আঁধার সে অন্ধকার নহে। মানবতার অপহ্নব ঘটিলে, মর্ম্মের মণি-প্রদীপে শ্রদ্ধার দেবদ্যুতি নিভিয়া গেলে, সংযম ও পবিত্রতার হোম-শিখা ম্লান হইলে, প্রীতি ও মৈত্রীর অগ্নিহোত্র-ব্রতবিচ্যুত হইলে, সর্ব্বোপরি হৃদয়-দিক-চক্রবাল হইতে ঈশ্বর-বিশ্বাসের সবিতৃ-জ্যোতি অস্তায়মান হইলে যে অন্ধকার জীবন ও ভুবনকে আচ্ছন্ন করে, ইহা সেই সর্ব্বনাশা তম। তাই বলিতেছি এস, তুলসী-তলে প্রাণের প্রদীপ জ্বালাইয়া দিই?

গৃহস্থের আঙিনার কোণে যে তরুটি পত্র ও মঞ্জরী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এ তুলসী তরু সে তুলসী নহে! তুলসী—বিষ্ণুপ্রিয়া!

ভক্তি, শ্রদ্ধা, সংযম, সদাচার—বিষ্ণুপ্রিয়া! প্রাণখানি তাহারই সমীপবর্ত্তী কর। ভক্তিতে গলিয়া যাও, শ্রদ্ধায় আকুল হও, সংযমে সুপ্রতিষ্ঠ হও, সদাচারে ব্রতী হও।—তুলসীমূলে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়া দাও!

আমার কুটীরপ্রাঙ্গণে যে তুলসী-তরুটি আবহমানকাল ধরিয়া শ্রদ্ধার গঙ্গাবারি-নিষেকে সম্পূজিত হইয়াছে, তাহাও যে শুখাইয়া উঠিল! মঞ্জরী নাই। পত্র স্খলিত! কাণ্ডটি শীর্ণ, মরণোন্মুখ! যে গৃহে তুলসীবৃক্ষ নাই, সে গৃহ শ্মশান। সে গৃহস্থ উৎসন্নের অভিমুখী। তুলসীর প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া শেষে কি আমাদেরও হোটেলবিহারী যাযাবর জাতিতে পরিণত হইতে হইবে! রজনী এখনও প্রথম যাম অতিক্রম করে নাই! এস! অশুদ্ধ বাস, অশুদ্ধ মন পরিহার করিয়া তুলসীমূলে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে।

বিলাতি বর্জ্জন করিলে ত শুধু চলিবে না! চিত্ত-মনের সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া যে ফেরঙ্গয়ানার অশুচি বসনখানি বিজড়িত রহিয়াছে, তাহাকে খুলিয়া ফেল! বিদেশী ও বিলাতী—উপসর্গ! ব্যাধি—বিলাতিয়ানা—ফেরঙ্গ-ভাব-বিমুগ্ধতা! উহার তম-বিষাক্ত বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত না হইলে প্রাণের মণিকোঠায় শ্রদ্ধাভক্তি, তেজ বীর্য্যের প্রদীপ-শিখা জ্বলিবে না, স্বদেশ ও স্বদেশীর প্রতিষ্ঠা হইবে না। ঐ বিলাতী ভাব ও ব্যসনের বসনাবৃত দেহে তুলসীমূলে দীপদান হয় না,—হইবে না। তাই বলিতেছি, বিলাতীর সহিত বিলাতীয়ানাও পরিহার করিতে হইবে।

তুলসীকে চেন নাই। উহা আত্মপ্রীতির প্রতীক। বৃক্ষপূজা আমরা করি না ;—করি, বিভূতির উপসনা। বলিয়াছি, তুলসী বিষ্ণু-প্রিয়া। যাহা বিষ্ণুপ্রিয়া—তাহাই আমার পূজ্য ও প্রণতির যোগ্য। শুদ্ধ ভক্তিপূত আত্মা বিষ্ণুর প্রিয়। এই পরিশুদ্ধ আত্মা পাইব কোথায় ? সংসারের সহস্র জালে জড়িত রহিয়া শুদ্ধির অবকাশ কোথায় ? স্বার্থের উদ্বেল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দিবসে আত্মশুদ্ধির অবসর পাই না, তাই সন্ধ্যার অবকাশে তুলসীমূলে প্রদীপ জ্বালিয়া প্রণতি জানাই, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ রাখি। বাহিরের প্রদীপখানি অন্তরের শ্রদ্ধার অভিব্যঞ্জনা। তুলসীমূলে প্রদীপ জ্বাল, নহিলে অধঃপাতের আঁধারে মানবতা যে আবৃত হইয়া গেল।

পাশ্চাত্য বিলাসের উপদ্রব সহিতেছি, সহিবার বুঝি ক্ষমতাও আসিয়াছে। নহিলে তুলসীতলে প্রদীপ নিভিয়া গেল, কিন্তু বিবাহ আইনত চলিল! বাঙ্গালার কুলাঙ্গনার ব্যভিচার লইয়া বিজেতা বিদেশীর আদালতে দরবার করিতে হইল ? অন্ধকার নহে ত কি ? এ যে প্রলয়ের আধার ? তুলসীমূলে প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে; তাই আজ বৃদ্ধ মহাত্মা গান্ধীকে সত্যাগ্রহে অভিযান করিতে হইয়াছে। বিলাতী যে আসে, বিলাতী যে চলে,—শুধু চলে না, দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—ইহার কারণ আত্মপ্রীতির জ্যোতি নিভিয়া গিয়াছে। তুলসী-মূলে প্রদীপ নাই!—বড় অন্ধকার! প্রাণের তুলসীতলে প্রদীপ জ্বালিয়া দাও ?

গৃহের আঙ্গিনা বুকে যে তরুটিকে প্রভাতে শ্রদ্ধার জাহ্নবীধারায়

ঝারি দিয়া এবং সন্ধ্যায় প্রীতির বর্ত্তিকা জ্বালিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা ত আজ নাই! আজ আঙিনায় ক্রোটন, গ্যাণ্ডিফ্লোরা, অলিন্দে অলিন্দে অর্কিট! বনস্পতির দিকে চাহি নাই, ফলভারে অবনত আম্ররসালকেও তেমন আদর করি নাই; যত করিয়াছি ঐ ক্ষুদ্র তরুটিকে! যুগে যুগে অমনি করিয়াছিলাম,—করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই না শক হুন তুর্ক-উপপ্লব সহিয়াও বাঁচিয়া আছি। আমার আমিত্বকে পরম মমতায় আকড়াইয়া ছিলাম বলিয়াই না রাষ্ট্রবিপ্লবের বিঘ্ন-বাত্যাকে সহিয়াছি,—সহিতে পারিয়াছি এবং টিকিয়া আছি। আর টিকিয়া আছি বলিয়াই আজ আবার অভ্যুদিত হইবার প্রচেষ্টা করিতেছি!

আর বুঝি টিকে না! তুলসীমূলে প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে—আত্মপ্রীতির সে দ্যুতি নাই! টিকিবার মত ধারা হইলে বেথুন কলেজ করিয়া সীতা সাবিত্রীর সমজাতীয়া আর্য্যকুলকন্যাকে লেখাপড়া শিখাইতে হইত না! নবদ্বীপ ভট্টপল্লীর চতুষ্পাঠীগুলি তুলিয়া দিয়া উচ্চমূল্যে এই ফেরঙ্গ অবিদ্যার বিকিকিনি করিতে হইত না। যে মেয়ে লরেটো বেথুনে পড়িয়া আসে, সে কি তুলসীতলে প্রদীপ দেয়! সে কি বাঙ্গালার ধামা কূলা ধুচুনি লইয়া থাকিতে পারে?—পারে না। তাই পমেটম আসে, রুজ আসে; ফ্রান্স জার্ম্মাণী-মার্কিণ হইতে ব্লাউজ-সেমিজ-বডির নানা রকমারি কাপড় আসে অর্থাৎ বিলাতীতে বাঙলার গোলা ও হাট-বাট ভরিয়া যায়। বুঝিলে, বিলাতী কোথায়? কোন্ বিষে মরিতেছি!—মরিবার সাধনা করিতেছি!

তুলসী—গাছ! ফল নাই, ফুল নাই!—চন্দনও সে নহে। তবু সে আমার পূজ্য ও প্রিয়। তোমার কাননে যে চম্পক চামেলি আছে, তাহার প্রতি আমার অনুরাগ আকর্ষণ নাই। কিন্তু আমার তুলসীতরুর প্রতি আমার অনুরাগ অগাধ এবং অপরিসীম!—কেন? এইটুকু বুঝিলে আর নারকীয়তার প্রতি আকর্ষণ আসিবে না! আর বিলাতীতে গৃহবাট পূর্ণ হইবে না! "আমি হিন্দু নহি" বলিয়া সিভিল ম্যারেজের আত্মহত্যাও করিতে হইবে না এবং আইন করিয়া প্রীতি ও প্রেমের দৈবীসম্পদকে যৌন ব্যভিচারে কলুষিত করিতে হইবে না। আত্মপ্রীতির একটা তপস্যা আছে। মন সহসাই উন্মার্গগামী হইয়া উঠে। চিত্তগতি স্বৈরিণী! তোমার ভালটির প্রতি আমার লোভ হয়। তাহাতে নিজস্বের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়। আপনার ভাল করিবার, কল্যাণের প্রচেষ্টা থাকে না। আমার ধনসম্পদকে ভালবাসিতে পারি, পুত্রকন্যাকে স্নেহ করিতে পারি; তাহা কিন্তু বড় স্বার্থপর, অনেকটা পশুস্তরের! ইহাতে ঊর্দ্ধগতি দান করে না অর্থাৎ যে মমতা থাকিলে বৃত্রবধের জন্য পঞ্জরাস্থি খুলিয়া দিতে পারা যায়, তেমন মহিম্ন ভাব উদ্‌বুদ্ধ করে না। তাই তুলসীকে অবলম্বন! তুলসী বিষ্ণুপ্রিয়া। ভাগবত ভাবের একটা প্রতীক। তর্ক করিও না। শুধু মনে রাখিও,—"ঢেঁকি ভ'জে যদি এই ভবনদী পার হ'তে পার বঁধু"। ঐ তুলসীকে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রীতির জাগৃতি হয় ও হইয়াছিল। লক্ষ্মীবাঈ, দুর্গাবতী তুলসীপূজারই ফল! প্রতাপ শিবাজীও

তাহাই! একটা সুদীর্ঘ উজ্জ্বল অবদান ঐ আত্মপ্রীতিকে অবলম্বন করিয়াই উদ্ভাসিত। তাই বলিতেছি, তর্ক করিও না। তুলসীমূলে প্রদীপ দাও।

ভগবানকে ধরিয়া থাক। ভাগবতস্পর্শ হইতে দূরে যাইলেই নরজন্ম—নারকীয় জন্মে পরিণত হয়। ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ ত আজিকার জগৎ! নারকীয় গতি চাহি না বলিয়াই তুলসীর কাছে প্রণতি জানাই, প্রদীপ জ্বালিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তুলসী বিষ্ণুপ্রিয়া। ফেরঙ্গ-বিজ্ঞানের বিকৃতদৃষ্টিতে বিচার করিও না—তুলসী বিষ্ণুপ্রিয়া কি না! শুধু মনে রাখিও—"ঢেঁকি ভজে যদি এই ভবনদী পার হ'তে পার বঁধু",—কিছু নহে, অন্তরে শুধু দৈবী-শ্রদ্ধার উদ্রেক করা চাই। তাহা হইলে নচিকেতার মত অভয় আসিবে, যমভীতি রহিবে না। এই জাতীয় জাগৃতির যজ্ঞাগ্নি-জ্বালায় অক্লেশে আত্মাহুতি দিবার সামর্থ্য জন্মিবে।

যুগ-সন্ধ্যায় তমিস্র অন্ধকার! মর্ত্যে মানব বিমোহিত, স্বর্গে দেবতা নিদ্রিত! তুলসীতলে প্রদীপ জ্বালিয়া সান্ধ্য-শঙ্খে ফুৎকার দাও। দেব ও মানব জাগ্রত হইবেন। অন্ধকার কাটিয়া যাইবে।

পিঠা-পার্ব্বণ

সাধের আবাহন আমাদের "এস পৌষ, যেও না।" যেও না!—সোণার বাঙ্গালায় এই পৌষমাস যে রস-মাধুর্য্য লইয়া আবির্ভূত হয়, তাহাতে বাঙ্গালীর রস-স্নিগ্ধ প্রাণ হইতে স্বতঃই ধ্বনিয়া উঠে—"এস পৌষ, যেও না!" পৌষের মহিমা এবং মধুরিমা অনবদ্য। এক দিকে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে হৈমন্তিক শস্যের শোভন শ্রী,—নলেন গুড়ের মন-মাতান গন্ধে সুরভিত-সমীরণ, অন্যদিকে আঙিনা উঠানে স্বর্ণকান্তি নব-জাত ধান্যের আশা-দীপ্ত আবির্ভাব। বাঙ্গালী রূপের সাধক—রসের পূজারী! বাঙ্গালী রূপ দেখিতে জানে,—তাই সে একদিন ভুবনে ঘোষণা করিয়াছে, "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।" আর ঐ জন্যই আজও বাঙ্গালার শ্যামায়মান পল্লী-গেহ হইতে মমতা-মধুর-কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠে—"এস পৌষ, যেও না।"

পৌষমাসের উৎসব পিঠা-পার্ব্বণ। পার্ব্বণ কেবল উৎসব নহে, উহা পূজাপার্ব্বণ। আমাদের পিঠা-পার্ব্বণেও পূজার ভাব ও অনুষ্ঠান আছে। সারা বৎসরের ফসল গৃহ-জাত হওয়াতে হর্ষ ও লালসার আতিশয্যে পিঠাপুলি খাই না; শুদ্ধাচারে, ব্রতের আচরণে অন্নরূপিণী জগন্মাতার প্রতীক মনে করিয়া পিঠা পার্ব্বণ

সম্পন্ন করি। অগ্রে নারায়ণকে নিবেদন করি, তাহার পর পায়স পিঠাপুলি খাইয়া আনন্দ-আহ্লাদ করি।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইতিহাস জান কি ?—'রেস্টুর‍্যাণ্টে বসিয়া কেক্ মদন-ছাবা (মাটন চপ্) যেমন করিয়া গেলা হয়, তেমন করিয়া পশুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পিঠাপুলি খাই না ।—খাইয়া পশুত্বের সেবা করি না।

আমার পিঠাপার্ব্বণ—তোমারও, আমি ও আমার পুত্রকন্যা এবং আত্মীয়-স্বজন একা একা উহা ভোগ করি না। গ্রামের ইতর ভদ্র যে যেখানে আছে, সকলকে সমাদরে আমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই খাই। শুধু শ্রেষ্ঠ ও অভিজাতকে আবাহন করি না, গ্রামের এক এক জন নগণ্য অধিবাসীকে পর্য্যন্ত আবাহন করি। কৃপায় নহে—মমতার আকর্ষণে !

ডিমোক্র্যাসী বল, অথচ মোটর হইতে—মার্ব্বেলখচিত অট্টালিকা হইতে এক পাও নাম না ! তোমার চব্য -চুষ্য-লেহ্য-পেয়র কণামাত্র অংশ কাহাকেও দাও না ; কিন্তু পিঠাপার্ব্বণের দিনে একবার দেখিয়া যাইও গণতন্ত্র কাহাকে বলে ! দেখিও শিরোমণি মহাশয় হইতে হিরু সর্দ্দার পর্য্যন্ত সকলে ও প্রত্যেকে মিলিয়া আমরা পায়স পিঠাপুলি খাই !

তাহার পর এই পিঠাপুলি—পায়সের সুমিষ্টতা কি অমৃত-তুল্য ! নলেন-গুড়ের পরমান্ন, চন্দ্রপুলি, গোকুলপিঠা, রসপুলি

খাইলে স্বর্গে যাইবার সাধও মিটিয়া যায়। যখন ভাজাপিঠা ভাজা হয়, তখন তাহার গন্ধ পারিজাতকেও হার মানায়।

সম্মুখে উত্তরায়ণ! সবিতৃদেবতা মৃদু মধুর কিরণ-ধারা বর্ষণ করিতেছেন! এস, সকলে মিলিয়া পিঠাপুলি খাই! বাঙ্গালার রূপ ও রসে মজিয়া যাই! যে রস আজ আমাদের প্রাণে বিশীর্ণ— পিঠা ও পায়সের রস-সম্ভোগ করিতে করিতে যদি আবার তাহা উথলিয়া উঠে, তবে মাকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী করিতে আবার সত্যকার সাধ জাগিবে!

উত্তরায়ণ

শৌর্য্য-বীর্য্য কখনও দেখিয়াছ কি? সাম্রাজ্য লইয়া ধূলিমুষ্টির মত নিক্ষেপ—রমণীর রূপ-রত্নকে আবর্জ্জনার মত পরিবর্জ্জন,—সমগ্র মানবজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুরভিত সাধ ও সাধনাকে ছিন্ন-বসনের মত পরিহার!—একটা বিরাট, একটা অপরিমেয়, একটা দুরবগাহ মহিমা কখন দেখিয়াছ কি? না দেখিয়া থাক, চল জাহ্নবীর পবিত্র নীরে অবগাহন করিয়া পরিশুদ্ধ হই! উত্তরায়ণের ব্রত পালন করি!

আজ উত্তরায়ণ। আজ দেবব্রত ভীষ্মদেব ইচ্ছা-মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। উত্তরায়ণ কিন্তু স্মৃতি-পার্ব্বণ নহে, শোকের অনুষ্ঠান—তাহাও নহে। উত্তরায়ণে মানবতার—স্ব-মহিমার প্রতিষ্ঠা! ক্ষুদ্র মানব—সহস্র বাসনা-কামনার দাস কি বিরাট, কি মহীয়ান্ হইতে পারে, তাহারই প্রদীপ্ত পরিচয় এই উত্তরায়ণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

স্বাধীনতা কাহাকে বলে! সহস্র কামনা-বাসনার বশে ছুটিয়া বেড়ান দাসত্বেরই রূপান্তর; লালসার আকর্ষণে উদ্বেলিত হওয়া, সেও ত বিকট পরাধীনতা! যে আত্মজয়ী, কামজিৎ, সেই ত স্বাধীন—স্বরাট্! সেই ত বীর! সেই ত প্রকৃত বিজয়ী পুরুষ! এমন

পুরুষোত্তম মহামানব নিখিল ভুবনে মাত্র একটী জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি এই ভারতের সন্তান—আর্য্যকুলোত্তম ভীষ্মদেব।

চল, গঙ্গাস্নান করিয়া স্নিগ্ধ শুদ্ধ হইয়া অনুধ্যান করি—এই উত্তরায়ণের মাহাত্ম্য। উপলব্ধি করি—মনুষ্যজন্মের সম্ভাবনীয়তা—কি মহিম্ন। ইহা শুধু ত্যাগ, আত্মত্যাগ ও সংযম নহে—ইহা বিজয়—ইহা মানবীয় শক্তির গর্ব্বদৃপ্ত পরিচয়।

মাটির জীব—মানুষ আমরা; সহস্র দুর্ব্বলতার দাস, লক্ষ লক্ষ কামনার পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া পরিশ্রান্ত, পশুত্বের এক বিকট পঙ্কপ্রবাহে নিত্য অবগাহন করিয়া আমরা অবয়বে মানুষ হইলেও মননে পশু হইয়া পড়ি; আজ উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান করিলে সেই পাশবতার ক্লেদ কালিমা ধৌত হইয়া যাইবে।

উত্তরায়ণ-পর্ব্ব প্রাচীনতার একটা অন্ধ সংস্কার নহে। সংসারের সহস্র সহস্র মোহস্পর্শে নিমেষে নিমেষে আমরা ভুলিয়া যাই—আমরা কি, মনুষ্যত্ব কি মহীয়ান,—মনুষ্য-জীবন কি লোকোত্তর হইতে পারে! সেই কাল বিস্মৃতি অপনোদনের জন্য এই সব ব্রত-নিয়ম-পূজা-পার্ব্বণ!

আজ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শুদ্ধচিত্তে শ্রদ্ধালুভাবে পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর নির্ম্মল নীরে অবগাহন করিয়া দেবব্রত ভীষ্মের সেই লোকোত্তর চরিত্র ও মহিম্ন আচরণ ধ্যান করিলে আমাদের প্রসুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইবে, আমাদের শক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করিবার অধিকার জন্মিবে।

আত্মবিস্মৃতির অপনোদন, ইহাই ত পুণ্য ! উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান করিয়া দানধ্যান করিলে—মহাপুণ্য হয়। যে পুরুষোত্তম নিখিল মানবের যুগ-যুগান্তের মুক্তির সম্বল রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিলে পুণ্য ত সামান্য—পুণ্যও ধন্য হয়।

ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, নিজেকে ধন্য বোধ কর। ধন্য বোধ কর যে, ভারতে জন্মলাভ করিয়া ভীষ্মের মত লোকোত্তর মহামানবের আদর্শ লাভ করিবার অবসর পাইয়াছ। ত্যাগ—কতটুকু ত্যাগ জগত দেখাইতে পারিয়াছে ? একটা জীবন লইয়া ধুলিখেলা, অচল মেরুর মত এমন ভীষ্মব্রত নিখিল মানবতার কল্পনার অতীত ! ভীষ্মের জীবন ভারতের গৌরব, কিন্তু নিখিল মানবতার সম্পদ।

উত্তরায়ণে দেবব্রত ইচ্ছা-মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুই ত জীবনের অপরিহার্য্য পরিণাম। এ মৃত্যু বিজ্ঞান, বিত্তৈশ্বর্য্য, ক্ষাত্রবল—কিছুরই অপেক্ষা রাখে না, আপনার অমিত তেজে মানুষকে গ্রাস করে ! সেই মৃত্যু—সেই ত্রিলোকজয়ী মরণ—ভীষ্মের আদেশের অধীন হইয়াছিল। বুঝিলে, ভীষ্মচরিত্রের মহিমা ও শক্তি ! বুঝিলে, এই উত্তরায়ণ কেমন পুণ্যক্ষণ !

শ্রীপঞ্চমী

শ্রী বলিলে শুধু সৌন্দর্য্য বুঝায় না। শ্রী, হ্রী, তুষ্টি, পুষ্টি। শ্রী জ্ঞানের প্রতীক—তাই শুভ্রবর্ণাভা, কুন্দ-ধবলা প্রস্ফুটিত শতদলবক্ষে চরণ রাখিয়া অমল-ধবল জ্যোতি বিকীরণ করিয়া যিনি আবির্ভূতা হন, তিনিই বাণী বীণাপাণি—সরস্বতী!

শ্রী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এ জ্ঞান বিজ্ঞান নহে, সংশয়ের কালিমায় অনুলিপ্ত নহে। এ জ্ঞান প্রজ্ঞান শাশ্বত সত্য। বিশ্ব-ভুবনের দীপ্তিদ্যুতি—তুষারহার-ধবলা। প্রজ্ঞার বর্ণ শুভ্র।

শুভ্রত্বের আর একটি দ্যোতনা আছে—পবিত্রতা ও পরিপূর্ণতা। ভারতীয় জ্ঞান সত্ত্ব ও শুদ্ধ। তাই শুভ্রবর্ণাভা জননীর রাতুল চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জ্ঞান ও প্রজ্ঞানের অধিকারী হইতে হয়। জ্ঞানে মালিন্য দূর করে,—অবিদ্যার তমসাচ্ছন্ন তীর হইতে বিদ্যার অমৃত লোকে উন্নীত করে,—বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে!

শ্রীপঞ্চমী করিয়া এটুকু বুঝিয়া লইতে হয় যে, বিদ্যা অবিদ্যা নহে—অনৃতের প্রবর্ত্তক ও উদ্বোধক নহে। বিদ্যা সত্ত্বগুণান্বিত, উহাতে অমৃতের পূজারী করে। জড় ও নশ্বরের যাহা ঊর্দ্ধে, যাহা পবিত্র সুন্দর, যাহা রজতমবিবর্জ্জিত একান্ত পবিত্র, তাহাই অমৃত!

সরস্বতী পূজা শ্রীর উপাসনা। শ্রী শুধু সৌন্দর্য্য নহে—পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপ ও রসের প্রতিমূর্ত্তি নহে—শ্রী বেদজ্ঞান অপৌরুষেয় সত্য। তাই জননীর চরণ প্রান্তে রূপের সহস্রদল অরবিন্দ বিকাশমান!—আর হস্তে বীণা বেদ-বিজ্ঞানের উদ্গাতা। আর্য্যজাতি জ্ঞানের উপাসক বলিয়া তাহার শিল্প, সাহিত্য, পল্লীগৃহ, তাহার দেবালয় দেউল, তাহার বসন-ভূষণ, আচার-আচরণ, তাহার কল্পনা-পরিকল্পনা; সঙ্গীত বিজ্ঞান মনোজ্ঞ মধুর; আবার তাহার অন্তর্জগৎ জ্ঞানালোকে দেদীপ্যমান। বুঝিলে কি?

এই বাণীপূজা শ্রীপঞ্চমী—আবার বসন্তপঞ্চমী! এই দিনে বিশ্ব-প্রাণ-সঞ্চারী মধুর সুন্দর বসন্তের আবির্ভাব সম্ভাবনা হয়। মাধবের চরণস্পর্শে যেমন আত্মার সদ্গতি হয়, তেমনি প্রাকৃত জগতও মধু-মাধবের মোহন পরষণে ধন্য হয়। বৃক্ষ বল্লরীতে কিশলয় কুসুম মুঞ্জরিত হয়, কুঞ্জকানন বিহগকূজন-কাকলীতে প্রতিরণিত হয়, আর দক্ষিণানীলের মৃদুমন্দহিল্লোলে বিশ্বপ্রাণ মাতিয়া উঠে।

এমন যে মধু-মাধব—জীবনপ্রদ, ওজপ্রদ, তাহার আবির্ভাবে যে আর্য্য-উৎসব, তাহাই বসন্তপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী। এই দিন হইতেই হোলী খেলার আরম্ভ!

আর্য্য ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে এই শ্রীপঞ্চমীর দিনে শুভযাত্রা করিয়া আর্য্য নরপতিগণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। সে কি উদ্যম! সে কি উদ্দীপনা! সে কি গগন-পবন মুখরিত জয় কোলাহল!

যাঁহারা ভাবেন, আর্য্যজাতি শুধু তপোবনের মাঝে সমাধিস্থ থাকিতেন এবং তাহারই ফলে দীর্ঘদিন পররাষ্ট্রবিজিত, তাঁহারা আত্মদ্রোহী—ভ্রান্ত। আর্য্যজ্ঞান সর্ব্বকে লইয়া পরিপূর্ণ। পূর্ণই তাহার ইষ্ট।

এইখানে একটু মজার কথা বলিব। সহরে বাস করিয়া, বৈদেশিক ভাবে সুপরিপক্ক হইয়া আমরা দেশের আচার-আচরণ, ব্রত-পার্ব্বণ এ সবের ইতিহাস ও রূপ বিস্মৃত হইয়াছি। নহিলে দেখিতাম—এই সরস্বতী পূজার দিনে এখনও পল্লী অঞ্চলে ঐ দিগ্বিজয়ের একটা অনুকরণ করা হয়।

শ্রীপঞ্চমীর দিন বই ছুঁইতে নাই। ঐ দিন গ্রামের বালক কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সকলে একত্র হইয়া, ডাণ্ডাগুলি, হিঙ্গে ডাঁড়ি প্রভৃতি খেলা করে। ঐ খেলা কতকটা যুদ্ধের অভিনয়। দেশের পল্লীগুলি যখন জীবন্ত ছিল, তখন এই সরস্বতী-পূজা ও ঐ দিনকার ক্রীড়াকৌতুকে সারা গ্রাম মাতিয়া উঠিত। হায় সে দিন!

বিদ্যায় অমৃতের অধিকারী করে! আজ শুদ্ধ অন্তঃকরণে যদি জ্ঞানদায়িনী জননীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই, তবে আমাদের প্রসুপ্ত জ্ঞান প্রবোধিত হইবে, বিগত শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইবে, দিগ্বিজয়ের সেই অপরাজেয় সামর্থ্য ফিরিয়া আসিবে। দেশ আবার ঐশ্বর্য্য-সম্পদে পূর্ণ শ্রী-বিমণ্ডিত হইবে।

আর্য্য জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়াই ত আমাদের এই দুর্দ্দশা;

জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই মুক্তি। যে বিদ্যার পরম অঙ্কে নচিকেতার মত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যে জ্ঞানের সুধাধারা পান করিয়া রাজর্ষি জনকের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল, যে পরমা শিক্ষার আনুগত্যে দিগ্বিজয়ী রঘুর তেজোবীর্য্যে আর্য্যভূমি ধন্য হইয়াছিল। যে শিক্ষার পরম প্রসাদ—ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির সেই মহিম্ন শিক্ষার আরাধনা করাই আমাদের পরম কর্ত্তব্য হইয়াছে। শ্রীপঞ্চমীর দিনে শ্রদ্ধালুচিত্তে আর্য্যজ্ঞানের আনুগত্য স্বীকার করিলে আবার সেই দিন ফিরিয়া আসিবে। ভারতের তপোবনে দেখিব, যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ; সিংহাসনে দেখিব, কার্ত্তবীর্য্য শ্রীরামচন্দ্র; শুদ্ধান্তঃপুরে দেখিব, মৈত্রেয়ী গার্গী; রণ-প্রাঙ্গণে দেখিব পার্থ শ্রীকৃষ্ণ! আর বন্দরে দেখিব পণ্যপরিপূরিত সাত ডিঙ্গার বদলে সহস্র ডিঙ্গা!

আজ শ্রীপঞ্চমী! চল কূটজ-দ্রোণ চয়ন করিয়া আনি! চল চল আম্রমুকুল যবশীর্ষ সংগ্রহ করি! এস এস সকলে একত্রিত হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে প্রণত হইয়া মায়ের শরণাপন্ন হই! আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে—স্ব-প্রতিষ্ঠ হইয়া স্বরাজলাভ করিব!

মাঘী-পূর্ণিমা

কোন্ মেঘে বজ্র আছে কেহই জানে না। কোন্ বিভূতি কোন পাত্রে অবস্থিত, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাই আমরা ঘটে ঘটে প্রণতি নিবেদন করি; ষষ্ঠী মনসা মাকাল—কাহারই পূজার প্রত্যবায় ঘটাই না। আমরা দূর্ব্বাকে শ্রদ্ধার চক্ষে অবলোকন করি; আবার অশ্বত্থের মূলেও নতি জানাই। আর্য্য-জাতির এই মঙ্গলপূজার মাহাত্ম্যটুকু আজ বিশ্ব সমক্ষে ঘোষণা করিবার দিন আসিয়াছে।

মাঘী পূর্ণিমা মানবজাতির বড় আশার দিন, আবার দুর্দ্দিনও বটে! এই দিনে কলিযুগের আরম্ভ বলিয়া এই দিন কুদিন, আবার কলিকালেই মানব সহজে মুক্ত হয় বলিয়া এই দিন বড় সুদিন।

দিন, ক্ষণ, বার, ব্রত—এই সব মানিলে ও পালন করিলে আর কিছু হউক্ আর না হউক, শ্রদ্ধা-বুদ্ধি জাগ্রত হয়। "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্"—শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানলাভ করেন। এ জ্ঞান বই পড়া আক্ষরিক জ্ঞান নহে,—এ জ্ঞান বুদ্ধির প্রাখর্য্য Intellectual luxury) নহে; এ জ্ঞান পরমা জ্ঞান! এ জ্ঞান—প্রজ্ঞান—কল্যাণে দীপ্তিমান, সত্যে সমুদ্ভাসিত। এই শ্রদ্ধার পরমা স্পর্শে দস্যু

রত্নাকর বাল্মীকি হইয়াছেন, মেষপালকের সন্তান লোকত্রাতা ক্রাইষ্ট হইয়াছিলেন। বিশ্ব-বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনে ল্যাবরেটারীর সাহায্য অপেক্ষা বৈজ্ঞানিকের শ্রদ্ধা বুদ্ধির শক্তিই সমধিক।

আজ মাঘী পূর্ণিমা। আজ শ্রীহরি স্মরণ করিয়া গঙ্গাস্নান করিলে জন্ম জন্মান্তরের পাপ বিমোচন হয়—মুক্তিলাভ হয়।

হিন্দুর মুক্তি—খৃষ্টানের উদ্ধার (salvation) নহে, খৃষ্টীয় তত্ত্ব চিন্তায় যেমন অনন্ত নরক ও অনন্ত স্বর্গ আছে, হিন্দুর পারমার্থিক মুক্তি তেমন একটা কিছু নহে। আমরা মুক্তি চাই—পাশবতার মুক্তি। মনুষ্য-জন্মে বা জীব জন্মে যে অশুদ্ধ পাশবতার স্পর্শ আছে, তাহা হইতে উদ্ধার হওয়াই মুক্তি—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। আমরা জীব-জনমে—এই মর-জগতেও মুক্তি চাই এবং পাই "যত্র জীব, তত্র শিব।" ঐ জীবত্বের মধ্যে শিবত্বের প্রতিষ্ঠাই মুক্তি।

মাঘী পূর্ণিমা স্থবিরতার একটা অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞার হাস্য ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু সংস্কারে, মার্জ্জিত রুচিতে, কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাও যে ভাবিবার দিন আসিয়াছে। সুরুচিসম্পন্ন জীবন—তাহার অর্থ নাগরিক পশু-জীবন। পশু তাহার অরণ্যে যেমন অবাধ স্বেচ্ছাচারী, আজিকার ব্রত পূজা পার্ব্বণ পরিত্যাগী—কামচারী নরনারীও তেমনি। একটি অসজ্জিত উলঙ্গ, অন্যটি সজ্জিত-আবৃত। বেদে বেদুইনের মত হোটেলে আহার পান, আর স্রোতের কুটার মত নর্ত্তন-কুর্দ্দন,—সংস্কার সুরুচির চরম !!!

পাল-পার্ব্বণ পাইলেই আমরা গঙ্গায় একটা ডুব দিই, গাছ পাথর

যাহাকে দেখি প্রণাম করি; কিন্তু ভিক্ষুককে একমুঠা দিতে কখন কাতর হই না; দূরসম্পর্কের আত্মীয় আত্মীয়াকে শত শত অক্ষমতা সত্ত্বেও পোষণ করি, হিংসাজর্জ্জর হইয়া ঐশ্বর্য্যবানের বুকে গুপ্ত ছুরিকার মৃত্যু-স্পর্শ আঁকিয়া দিই না।

কলিকাল বড় ধন্য যুগ! এই কলিযুগের আবির্ভাব ক্ষণেই কুরুক্ষেত্রে পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য বিঘোষিত হইয়াছিল। গীতা—কলিযুগেই গীত। গীতা ভগবৎমুখনিঃসৃত ত বটেই, আবার সর্ব্ব উপনিষদের সারও বটে। অন্যযুগে সুকঠোর তপস্যা করিলেও যাহা না হয়, কলিতে এক বার জপে তাহা হয়;—সিদ্ধ হয়!

পাপের ভার ত একদিনে বৃদ্ধি পায় না; যুগে যুগে সঞ্চিত মহাপাপ এক দিন স্তূপীকৃত হইয়া উঠে। পাপই ম্লেচ্ছধর্ম্ম, ম্লেচ্ছপ্রকৃতি পূর্ব্বগামী যুগত্রয়ের পুঞ্জিভূত তমোভাব, আজ ম্লেচ্ছভাবে সারা জগতে অনাচার কদাচারের ভৈরব-লীলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আজ ব্যষ্টি মানব ম্লেচ্ছ, সমষ্টি মানব ম্লেচ্ছ। তাতার, বেদুইন, নিগ্রো, কাফ্রী শুধু ম্লেচ্ছ নহে। ম্লেচ্ছ আজ—ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ; ম্লেচ্ছ আজ—নিখিল আর্য্যভারত।

ম্লেচ্ছতা একটা ভাব, একটা মনোবৃত্তি। শ্রদ্ধাহীনতা, স্বেচ্ছাচার, উন্মার্গ আচরণ, এই সবই ত ম্লেচ্ছপ্রবৃত্তির লক্ষণ। পশু মানব ম্লেচ্ছভাবে আকর্ষিত হইতে পারে; কিন্তু মানবের অন্তর্য্যামী চাহেন শুদ্ধাত্ম হইতে। এই কলিযুগে ঐ ম্লেচ্ছভাবের ধ্বংস হইবে। "ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালম্।"

কলিযুগে জয় ঘোষণা ত ঐ জন্যই “ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালম্।” এ ম্লেচ্ছ—জাতি-ম্লেচ্ছ নহে, ভাব-ম্লেচ্ছ। যেখানে যাহার মধ্যে ঐ ম্লেচ্ছভাবের স্পর্শ ঘটিয়াছে, তাহারই নিধন। বলিয়াছি, কোন মেঘে বজ্র লুক্কায়িত আছে তুমিও জান না, আমিও জানি না। ম্লেচ্ছ-নিবহ নিধনকারী, খর করবালধারী কাহাকে তাঁহার করাল যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া বলি দিবেন, তাহা কেহই জানে না। তবে ইহা জানি যে, এবার ম্লেচ্ছ-ভাবের—পাপের নিস্তার নাই।

মাঘী পূর্ণিমার পার্ব্বণ ক্ষণে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া গঙ্গাস্নান করিলে সদ্য স্বর্গ ও মুক্তি যে হয় না, তাহা ত জানি ও বুঝি; কিন্তু যাহা হয়, তাহা যে সহস্রটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথিগত বিদ্যায় অধিগম্য হয় না।—সভ্যতার ষোড়শ উপচার আয়োজনেও তেমন হইবার সম্ভাবনা নাই। মাঘী পূর্ণিমার পার্ব্বণ পালন করিলে অন্তরে শ্রদ্ধা-বুদ্ধি জাগ্রত হয়। শ্রদ্ধাই যে পশু-মানবকে দেব-মানবে উন্নীত করে।

বড় আনন্দ মনুষ্যজাতির— বড় আনন্দ। এবার বিশ্বের ম্লেচ্ছ-ভাব বিনাশ হইবে। মানব আবার শুদ্ধসত্ত্ব হইবে। ম্লেচ্ছনিবহ নিধনকারী কল্কি অবতার হস্তধৃত ভীষণ করবালের বিদ্যুৎ দীপ্তি দেখিতে পাইতেছ কি? না পাইয়া থাক, চল গঙ্গা স্নান করিয়া আজ মাঘী পূর্ণিমার ব্রত পালন করি; আর কোটী কণ্ঠে উচ্চারণ করি, জয় জগদীশ হরে! জয় জগদীশ হরে! ম্লেচ্ছত্ব নিধনের আর বিলম্ব নাই।

দোল-লীলা

আমাদের যত মহিমাই থাকুক, অসুর এবং আসুরিকতাকে আমরা সহি না, সহিতে পারি না। যখনই অসুর ও আসুরিকতার উপদ্রব হইয়াছে, তখনই আমরা পঞ্জরাস্থি খুলিয়াও অসুর বিনাশের আয়োজন করিয়াছি। এমনি যুগে যুগে কত বার। এই দোল-লীলাও ত অসুরবধের পর আনন্দাতিশয্যের একটা সমারোহ উৎসব। মৃঢাসুর বিনাশের পর বৃন্দারণ্যের গোপগোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে আবীর-কুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত করিয়া যে হর্ষপুলক অভিব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাই ত দোললীলা!

এ দোল সে দোল নহে! যে দোলে কামনার বীচিমালা হৃদয়কে আন্দোলিত করে! এ দোল সে দোল নহে, যাহাতে দক্ষিণানিল পরশনে সহস্র কামনার মুকুল মুঞ্জরিত হইয়া উঠে! এ দোল সে দোলও নহে, বাসন্তী চন্দ্রালোক পুলকিত নিশীথে প্রকৃতির মুক্ত মাধুরীতে আকর্ষিত হইয়া হৃদয়-সরিতে যে তরঙ্গভঙ্গ উত্থিত হয়! এ দোল মুগ্ধ তরুণ-তরুণীর লাস্য লীলার চলচাপল্য নহে! এ দোল মাধুর্য্যের মনোহারিত্ব নহে, কিশলয়কোলে নবমল্লিকার উন্মেষ নহে; এ দোল শ্রীমাধবের মাধবীলীলা।

এ দোলে বাঁশরী বাজে, কালিন্দীর কালো জলে তুফান উঠে, নীপ নিকুঞ্জে কুসুম-হিন্দোলা আন্দোলিত হয়, কৌমুদীবিশুভ্র

রজনীতে গোপাঙ্গনা প্রমোদে মাতে। কিন্তু তাহার আগে মৃচ্যাসুর বধ হয়। দোলের রহস্য ত উহাই!

আনন্দ হয় না!—অশুভ, অশুচি, আসুরিকতা কিছু থাকিতে আনন্দ হয় না। দোললীলার অনুষ্ঠান তাই অসুর-বিনাশের পর! অসুর ও আসুরিকতাকে স্বীকার করিয়া আনন্দ পাওয়া যায় না। আনন্দ ব্রহ্মস্বরূপ! অসুর দেবদ্বেষী। সত্ত্ব শুভ্র আনন্দ যে চায়, তাহাকে আসুরিকতার অবসান ঘটাইতে হইবে!

নবকিশলয় তাহার স্নিগ্ধ শ্যামলিমার বিকাশ ঘটাইয়া, ধীর পবনসঞ্চারে আন্দোলিত হইয়াছে! পাপিয়ার কূজন, কোকিলের ঝঙ্কার দিল্লাগুল আকুলিত করিয়াছে! পুষ্পকলিকার বক্ষোবিচ্যুত পরিমল ভুবনের মাঝে এক নবীন আবেশ উন্মাদনা জাগাইয়াছে, মর্ম্মের হিন্দোল দোলা দুলিয়া দুলিয়া উঠে! কত সাধ যায়; কিসের আবেশ মাতাইয়া তোলে। ইহাই বুঝি বসন্তের পরশন! দোলের আবাহন।

ভ্রান্তি! দোল, লালসার নর্ম্মলীলা নহে; বাসনা-ব্যাকুল নর-নারীর অনুরাগের আবেগে রতিক্রীড়াও নহে; ফাগ ও কুঙ্কুম তরুণীর মদির কপোলের লালিমা নহে; কিশলয়ের বর্ণরাগ নহে, পুলকিত যৌবনের লাবণ্যরেখাও নহে। হোরী শ্রদ্ধাভক্তির রক্তরাগ। আবীর-কুঙ্কুম অনুরক্ত ভক্তের ভক্তির উপঢৌকন। অনুরাগের ও ভক্তির আতিশয্যে রক্তরঞ্জিত! দোল—সৃষ্টি ও স্থিতির শাশ্বতী ছন্দ।

গতি,—সবই ত গতি। সৃজনও গতি,—সংহরণও গতি। গতির আঘাতেই জীর্ণ পত্র ঝড়িয়া পড়ে, আবার গতির প্রেরণাতেই নবপত্র উদ্গত হয়। একটা ঊর্দ্ধগতি, আর একটা অধোগতি।—সীতা-হরণের জন্য রাবণের পঞ্চবটী উদ্দেশে নিষ্ক্রমণও গতি, আবার পিতৃ-অঙ্ক পরিহার করিয়া তপশ্চর্য্যার জন্য ধ্রুবের বনগমন, উহাও গতি।

ফাল্গুনের মধুর স্পর্শ, বিহগের কূজনকাকলী, বাসন্তী সমীরণের মদির শিহরণ, কুসুমপুঞ্জের—সুরভি গন্ধ, অন্তঃকরণের মাঝে একটা উদ্দাম চাঞ্চল্য আনিয়া দিতেছে। হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। কত সুরভিত সাধ, কত সুশোভিত আশা! বসন্ত শুধু বনে নহে, মনেও তাহার বিকাশ ঘটাইয়াছে। এই সাধ ও সাধনা, ভাব ও ভাবনা পরিপূর্ণ—সৌন্দর্য্য বিগ্রহের প্রতীক্ষা-কাতর। রসের এই অনন্ত আস্বাদন লভিবার জন্যই মানবের জীবন-প্রচেষ্টা!

ফাল্গুন দিনে সেই জন্য দোললীলার অনুষ্ঠান। মাধবীস্পর্শে জীবনের সমগ্র অনুভূতি—পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়া সুন্দরের সঙ্গ কামনা করে! অনুরাগের আবীর-কুঙ্কুমে শ্রীহরিকে অনুরঞ্জিত করে। মানুষ হইয়া, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দাস হইয়া কামনাকে ত এড়াইতে পারি না; তাই শ্রীহরিকে আহ্বান করিয়া হৃদি-হিন্দোলায় দোলাইয়া দিই। বাহিরের অসুর মরে, আবার অন্তরে কুভাবের, কু-কামনার অসুরও বিনাশ পায়।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বাসন্তী উৎসবের অবসান। উৎসবও একটা ব্যসন। কিন্তু ভগবানকে মাঝে রাখিয়া উৎসব করিলে উৎসব—

পূজার পর্য্যায়ে উন্নীত হয়—লীলা হয়। গত প্রতীচ্য মহাসমর-বিরতির দিবস য়ুরোপীয় জাতি হরি-হীন উৎসব করিয়াছিল, তাই সে উৎসবে পশ্বাচারের তাণ্ডব চলিয়াছিল! মাধবী-উৎসবের কেন্দ্রস্থলে শ্রীমাধব না থাকিলে তাহা প্রেত-লীলা হয়।

ভক্তির বর্ণ রক্তিম। তাই আবীর কুঙ্কুম রক্তবর্ণাভ! দোল-লীলায় হোরী খেলিতে হয়, কুঙ্কমে আবীরে শ্রীভগবান্‌কে রঞ্জিত করিতে হয়। চিরসুন্দর যিনি, তাঁহার ত আর বর্ণের অনুরঞ্জনের প্রয়োজন নাই! ভক্তের সাধ মিটাইবার জন্যই এই হোরীখেলার বিধান। অনন্ত সুন্দরকে যে শোভিত করিতে চায় ও পারে, সে ত কৃতকৃতার্থ—পরম ভাগ্যবান্!

আজ দোল! মাধবী পূর্ণিমা। সারা বর্ষের দিবস যামিনীর, ষড়ঋতুর সুষমার পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা আজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। আজ হৃদয়ের দোলন-দোলায় মধু-মুর-নরক বিনাশন, রস স্বরূপ, চিরসুন্দর শ্রীমধুসূদনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সোহাগে, আবেগে, অনুরাগে, শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্দীপনায় দোলন দিয়া তাঁহার বরবপুকে ফাগের রঙ্গে রঞ্জিত না করিলাম, তবে নরজন্ম ত ব্যর্থ হইয়াই রহিল।

কে বলিল,—দোল একটা বাসরবিলাস? উদ্ভিন্ন যৌবনের রতি রাগ? দোল—বিজয়োৎসব। অসুর-বিনাশের সার্থকতার সুখ-বিহ্বলতা। এ অসুর বৃন্দারণ্যের অভিসম্পাত ও উপদ্রব। এই অসুর মানবতার অপহ্নবকারী তামসিকতা। শ্রীভগবানের শরণ লইলে উভয় অসুরই ধ্বংস হয়।

সুখ কোথায় ? উপদ্রবের অশনি সম্পাতে, আসুরিকতার পীড়ন প্লাবনে বৃন্দাবনের আভীর নাগরিক বুঝি এককালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। উৎপাতের উৎকটতায় এমন নৈরাশ্য আসে যে, মনে হয় এই নির্য্যাতন দুঃখই বুঝি শেষ, ইহার বুঝি যবনিকা নাই। এই বৈনাশিক নৈরাশ্যের অবসানের জন্যই ত এই দোললীলা !

যুগে যুগে যিনি দুর্গতিনাশন, সেই মধুকৈটভবিনাশন—শ্রীভগবান অসুর সংহার করিয়া মানবকে সমুদ্ধার করেন! তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, হৃদি-হিন্দোলায় অধিষ্ঠিত করিয়া ভক্তির আবীর-কুঙ্কুমে শ্রীমাধবকে অনুরঞ্জিত করিলে অসুর-ভীতির সহিত ভবভয়ও মোচন হয়।

চন্দ্রিকা-বিহসিত রজনী, দক্ষিণ সমীরণের মধুর হিল্লোল, কূজন কাকলীর মদির আকর্ষণ,—বিশ্বপ্রকৃতি মাধুর্য্যের, সুষমার সুধাপাত্র উজাড় করিয়া দিতেছেন। আমরা কিন্তু অসুরভাবপীড়িত, অবনত ; এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ আমাদের অদৃষ্টে নাই। তাই ত দোলের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবানকে আহ্বান করি। এস এস, পীড়িত ভারত ! আজ হৃদয়ে বাহিরে হিন্দোল দোলনে শ্রীমাধবকে প্রতিষ্ঠিত করি। তাঁহার শ্রীচরণে শ্রদ্ধাভক্তির আবীর কুঙ্কুম অর্ঘ্য দান করি। এস, আজ শ্রীহরির সহিত আমরা—অবোধ, আমরা —নিঃস্ব, আমরা ভাগবত ঐশ্বর্য্যের কাঙাল—গোপ-গোপাঙ্গনা হোরী খেলা করি। অসুর ধ্বংস হইবে, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া জাতীয় জীবনে আবার বসন্ত মাধুরীর আবির্ভাব ঘটিবে।

———